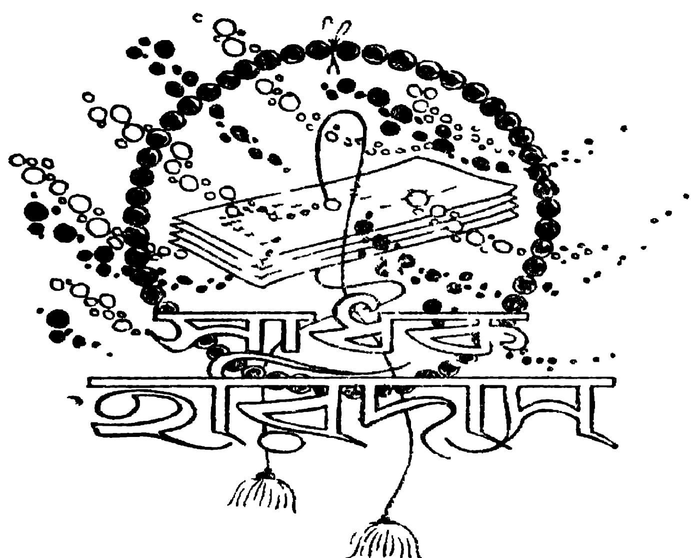


ভবেশ দত্ত



ভোলানাথ প্রকাশনী
৩/১১, বেনিয়াটোলা লেন • কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ : ১লা বৈশাখ, ১৩৬৭

প্রকাশক

সুরেশ দাশ

ভোলানাথ প্রকাশনী

৩৭।১১, বেনিয়াটোলা লেন

কলিকাতা-৯.

মুদ্রক

জগন্নাথ পান

শান্তিনাথ প্রেস

১৬নং হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট

কলিকাতা-৬

সোনাই নদীর ধার দিয়ে বিরাট মাঠ।

ধান কাটা শেষ হোয়ে গিয়েছে। সারা মাঠে ধানের গোড়া-গুলো মাটি আটকে পড়ে আছে। এখন আর মাঠে ধান নেই। কোন কোন যায়গায় বুনো ঘাস ক্ষেতের আলের ওপর হয়তো ঝোপ বেঁধে আছে। বিস্তীর্ণ মাঠের মাঝে মাঝে দু-চারটে আম গাছ। জগ্যডুমুরের গাছ—আরও কিছু দূরে বুনো গাছের জংগল। সকালের রোদের যখন তেজ বাড়ে তখন পাশের ভাটকলাগাছি গ্রাম থেকে এক পাল গরু এসে মাঠে চরে বেড়ায়। জল তেষ্টা পেলে সোনাই নদীতে নেমে জল খায়। নলখাগড়ার বন মট্‌মট্‌ কোরে ভাঙে গরুর পায়ে।

গরুর রাখাল পনেরো ষোল বছরের একটা ছেলে। যেমন সুন্দর তার চেহারা তেমনি তার দেহের গড়ন। তেমনি ঝাঁকড়া মাথার চুল। গলায় একটা মুসলমানী তাবিজ। মাথায় একটা গামছা বাঁধা।

রোদ্দুর যখন ধীরে ধীরে ভাটকলাগাছি গ্রামের ঐ ন্যাড়া তালগাছটার মাথার ওপর গরম ছড়ায় তখন ঐ ছেলেটি এসে শুয়ে পড়ে ক্ষেতের মাঝে এক আম গাছের তলায়।

ফিরফিরে হাওয়ায় গভীর ঘুমে অচেতন হোয়ে পড়ে।

সেই ফাঁকে কোন কোন গরু আশপাশের গৃহস্থের বাগানে ঢুকে এটা ওটা খেয়ে ফেলে। কোনটা বা কারও বিচালির গাদায় মুখ দিয়ে তছনছ করে। গৃহস্বামীর কান ঝালাপালা হোয়ে যায় নালিশের পর নালিশে।

বকুনি খায় ছেলেটা গৃহস্বামীর কাছে ঃ—তোর জ্বালায় দেখছি এবার গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে হবে। মুসলমানের ছেলে তুই। ক্ষেত খামারে রাখালী না কোরলে খাবি কি কোরে? ছোটবেলায় তোর বাপ মা মরে গেলো। নিয়ে এসে মানুষ কোরলাম। এখন তুই যদি কাজকর্ম মন না দিয়ে করিস তাহলে থাল থাল ভাত দেবো কেন? আর কদিন দেখি তারপর তোর কাজকর্মে যদি মন না বসে তাহলে আর আমি তোকে রাখতে পারবোনা।

ছেলেটা কোন কথা বলে না।

মুখ নীচু কোরে দাঁড়িয়ে থাকে। তার দুচোখ দিয়ে জলের ধারা গড়িয়ে পড়ে।

যার বাপ মা নেই তার চোখের জলে এমনি কোরেই বুঝি বুক ভাসে। ছেলেটা গরু তাড়িয়ে নিয়ে চলে যায় সোনাই নদীর ধারে। আপনমনে গরু চরে বেড়ায়।

খুটে খুটে খায় সেই ধানের গোড়া।

ছেলেটা আমতলায় এসে বসে বসে ভাবে ঃ—যার কেউ নেই তার তো ভগবান আছে। দুঃখ কষ্ট হোলে প্রাণ ভরে তাঁকে ডাকলে তিনি সাড়া দেন। যে ডাকে তিনি তার কাছেই আসেন। দুঃখহারী ভগবানই তো দুঃখীর একমাত্র ভরসা। এসব কথা তো সেদিন হিন্দুপাড়ায় এক কথকতার আসরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনে এসেছে। তবে তার ডাকেই বা তিনি আসবেন না কেন! সেও তো বড় দুঃখী।

রোদ্দুরে ভরে গেছে সারা মাঠ।

আবার সেই শিরশির ঘুম পাড়ানী হাওয়া উঠেছে।

ঘুম আসছে।

কিন্তু যদি সে ঘুমিয়ে পড়ে তাহলে তো গরু চলে যাবে কোন

গৃহস্থ বাড়ীতে। আবার হয়তো নালিশ জানাবে, তারপর তাকে দূর কোরে দেবে। জলপান্তা যাও জুটছিল তাও আর মিলবেনা।

ছেলেটা এই সময় জোড় আসনে বসে হাত জোড় কোরে বলেঃ—ভগবান এ সময় আমার বড় ঘুম পায়। হয় আমার ঘুম কেড়ে নাও আর না হয় এ সময়টা তুমি এসে আমার গরুগুলো চরাও।

তার চোখ ঘুমে ঢুলে পড়ে। মাটিতে গামছা পেতে আম গাছের একটা শিকড়ের ওপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ে।

ঘুম ভেঙে যখন যায় তখন দেখে সব গরুগুলো আমগাছের তলায় এসে জড়ো হোয়েছে। কোনটাও এদিক ওদিক যায়নি।

নিত্যই এই ঘটনা ঘটে। ছেলেটা খুসী হয়। নিত্য তার ঘুমের ও কোন ব্যাঘাত হয় না। কোন গরু কারও কোন ক্ষতি করে না। কেউ তার মনিবের কাছে নালিশও জানায় না।

ছেলেটা ভাবে—ভগবান তার ডাকে সাড়া দিয়েছেন। ঠিকই বোলেছেন ঠাকুর, যার কেউ নেই তার ভগবান আছে যে তাঁকে ডাকতে পারে আকুল ভাবে তিনি অবশ্যই তার ডাকে সাড়া দেন। তিনি যে দয়াময়।

ছেলেটার মন এবার পাগল হোল তাঁকে দেখতে হবে। কেমন তাঁর রূপ। বেশ কয়েকদিন কেটে যায়।

আজ আর তার ঘুম আসে না রোজ ঘুমালে কে তার গরু চরায় তা দেখতে হবে। দুপুর গড়িয়ে যায়। ব্যাকুল ভাবে ছেলেটা তাকায়। কই কিছুই তো দেখতে পায় না। আমগাছ বেয়ে ওপরের ডালে উঠে চারপাশ তাকায় কিন্তু কিছুই দেখতে পায় না। গাছ থেকে নেমে আসে নীচেয়। গরুগুলো তেমনি ভাবে সব এসে জড়ো হয় গাছতলায়।

এবার বাড়ী ফেরার পালা।

একটা বাছুর ছুটতে ছুটতে একেবারে তার কোলের ওপর এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ছেলেটা তার গায় হাত বোলায় আর ভাবে সেই একই ভাবনা, কে তার গরু চরায়।

আপন মনে বাছুরটার গা চুলকায় আর বলে—হ্যাঁরে তোরাও কি বোলবি না সারা দুপুর কে তোদের চরিয়ে নিয়ে বেড়ায়।

বাছুরটা ছেলেটার গা হাত পা চাটে।

হোল না, আজও হোল না।

আবার কাল দেখতে হবে। ছেলেটার মনে বড় সন্দেহ জাগে।

সোনাইয়ের জলে অন্ধকার নামে। সূর্য ডুবে গেছে আগে আগে।

ছেলেটা গরু তাড়িয়ে নিয়ে বাড়ী যায়।

গৃহস্বামী ভারী খুসী।

বলে ঃ—মন দিয়ে কাজ কোরলে তার কি কোন কৈফিয়ৎ দিতে হয়। কই এখন তো কেউ আসে না আর নালিশ জানাতে। কাজে ফাঁকি দেওয়া আর খোদাকে ফাঁকি দেওয়া একই কথা।

ছেলেটার মন কিন্তু পড়ে থাকে মাঠে। আবার কখন সকাল হবে কাল দেখতেই হবে। এমন বন্ধু তার কে, তাঁকে না দেখলে মন যেন কিছুতেই আর স্থির হোচ্ছেনা।

এই আকুলতা আর ব্যাকুলতা ছেলেটাকে আচ্ছন্ন কোরে রাখে।

সন্ধ্যার অন্ধকার চারিদিক ছড়িয়ে পড়ে। আজ আবার যেতে হবে কথক ঠাকুরের পাঠ শুনতে। কি সুন্দর যে পাঠ করেন লোকে তন্ময় হোয়ে শোনে।

সে ভাল কোরে হাত পা ধোয় তারপর মাঠের কাপড়টা ছেড়ে আর একটা কাপড় পরে। কার উদ্দেশ্যে যেন হাতজোড় কোরে প্রণাম জানায়।

হন হন কোরে পথ বেয়ে চলে যায় ছেলেটা।

ভাটকলাগাছিতে এক হিন্দু বাড়ীতে পাঠ হচ্ছে।

সারা উঠান জুড়ে পুরুষ মেয়ে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা বসে পাঠ শুনছে।

কথক ঠাকুর বোলছেন—জীব শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস। তাঁর দাসত্ব ছাড়া যে যা নিজের সুখের জন্য করে সবই মিথ্যে। এ সংসার তাঁরই। আমরা তো তাঁরই সংসারের রাখাল। আমার আমার কোরে দিন কাটাচ্ছে কিন্তু আমার বোলতে কি এ দুনিয়ায় কিছু আছে। আমার বোলতে সারা জগতে একটা জিনিষই আছে তা হোচ্ছে আমার কৃষ্ণ, আমার জপতপ কৃষ্ণকে ঘিরে। আমার ঘুম জাগরণ সবই তাঁকে ঘিরে।

"আশ্রয় জানিতে কহি এ নব পদার্থ।
এ নবের উৎপত্তি হেতু সেই আশ্রয়ার্থ॥
কৃষ্ণ এক সর্বাশ্রয় কৃষ্ণ এক ধাম।
কৃষ্ণের শরীরে সর্ব বিশ্বের বিশ্রাম॥"

কৃষ্ণাশ্রয়ই জীবের বড় আশ্রয়। এ আশ্রয় যার নেই তার মনুষ্যজন্ম বৃথা। এ আশ্রয় পেতে গেলে কি কোরতে হবে। ভগবান নিজেই বোলছেন ঃ

"আমারে ঈশ্বর মানে আপনাকে হীন।
তার প্রেমে বশ আমি না হই অধীন॥
আমারে তো যে যে ভক্ত ভজে যেই ভাবে।
তারে সে সে ভাবে ভজি এ মোর স্বভাবে॥"

আমাকে যে যে ভাবে ডাকবে আমি ঠিক সেই ভাবে তার কাছে যাবো। মায়াবদ্ধ জীব আমরা সংসারে পুত্র কন্যা পত্নী নিয়ে বাস কোরছি। তাদের সুখ দুঃখের ভাগীদার হোয়ে হাসছি কাঁদছি। ছেলে ছেলে কোরে তোমার ঘুম নেই। তার সেবা-যত্নের জন্য তোমার মাথার কালো চুল সাদা হোয়ে গেলো। একদিন সেই ছেলে তোমায় ফাঁকি দিয়ে পালালো। কেন তোমার ছেলে তুমি ধরে রাখতে পারলে না? এ বাঁধনে বাঁধা থাকলে তাঁকে পাওয়া যাবে না। কাঁদতে হোলে তাঁর জন্য কাঁদো, ভাবতে হোলে তাঁরই জন্য ভাবো। এ ছাড়া অন্য কাজ কাজই নয়। ডাকতে হবে, কাঁদতে হবে—তিনি নিশ্চয়ই আসবেন। তিনি যে দুঃখীর ভগবান তাঁর মত দয়াল আর কে আছেন? ডাকলে যিনি দেখা দেন তিনিই তো কৃষ্ণ। ভাবলে যিনি ভাবে আসেন তিনিই তো কৃষ্ণ। কাঁদলে যিনি নিজেও কাঁদেন তিনিও কৃষ্ণ। কৃষ্ণময় জগত না হোলে কৃষ্ণপ্রেম হবে না।

"কৃষ্ণাবলোকন বিনা নেত্রে ফল নাহি আন।
যেই জন কৃষ্ণ দেখে সেই ভাগ্যবান।"

কথক ঠাকুরের চোখ দিয়ে অঝোর ধারে জল পড়ছে।

এ চোখের জলের উৎস কোথায়?

সেই কৃষ্ণ সরোবরে।

ছেলেটা ধানের গোলার একপাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। সে কান্নার সুর ভেসে এলো পাঠের আসরে।

—কে কাঁদেরে?

কেউ সাড়া দেয় না।

আবার সেই কান্নার সুর ভেসে আসে।

কথক ঠাকুর বোললেন—তোমরা কেউ দেখোত ওখানে কে

কাঁদে—আহা কার এমন ভক্তি! কৃষ্ণকথা শুনে যে ফুঁপিয়ে কাঁদে কৃষ্ণ কৃপা তারই তো হয়। সেই তো কৃষ্ণ প্রেমের প্রেমিক।

দু-একজন উঠে এসে দেখে ছেলেটা গোলার পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছে। কে একজন চীৎকার কোরে বোললে—ঠাকুর মশায় কাঁদছে তমিজ মিঞার সেই রাখাল ছেলেটা।

—ওটা গরু চরিয়ে বেড়ায় না?

—হ্যাঁ!

—জিজ্ঞেস করো না, কাঁদে কেন—

—ওকে ছোঁবে কে, ও যে যবন।

—দূর থেকে জিজ্ঞেস করো—

ছেলেটা কাউকে কিছু না বোলে আনমনে চলে যায়।

রাতে আর ঘুম আসে না। ছেলেটার সারা দেহে মনে একি জ্বালা, একি অস্থিরতা। ভাবতে ভাবতে কখন যেন ঘুমিয়ে যায়।

সোনাই নদীর ধারে আজও আবার গরু এসে জল খায়। কাশবন ভেঙে গরুর পাল নামে সোনাই নদীতে। ছেলেটা এসে তাড়িয়ে নিয়ে মাঠে যায়। ভরা দুপুরের সময় আবার সে ঐ আমগাছটার তলায় এসে বসে। ঘুমের একটু ভাব এসেছে এমন সময় শুনতে পায় কে যেন বোলছে—যা না ঐদিকে যা। আবার ছোটে। ঐ মাঠে ঘাস আছে যা।

ছেলেটার ঘুমের রেশ ছুটে যায়।

উঠে দাঁড়ায়—কই কেউ তো না। তবে গরু তাড়াচ্ছে কে!

আবার এসে সে বসে গাছতলায়। গরুগুলো আপন মনে চরে বেড়াচ্ছে—কোনটা ছুটছে, মনে হোচ্ছে কে যেন তাকে তাড়া করেছে।

ছেলেটা বিরক্ত হয়ে আবার ফিরে আসে।

সূর্য তখন ভাটকলাগাছি গ্রামের এক পাশে হেলে পড়েছে।

এমন সময় ছেলেটা দেখতে পেলো একটা কালো ছেলে তার দিকেই হাসতে হাসতে আসছে। কি সুন্দর ছেলেটা কিন্তু মুখখানা তার রোদের তাপে যেন পুড়ে গেছে।

ছেলেটা বোললে ঃ—তুমি কে গো ?

জবাব আসে ঃ—রোজই তোমার গরু চরাই আর তুমি বোলছ কে, তোমার বড় কষ্ট। আর তাছাড়া রোজ রোজ ডাকলে আমি কি কোরে থাকি তাই রোজ এসে তোমার গরু চরাই।

—তুমি কে, কোথায় থাকো ?

—আমি সব জায়গায় থাকি, যে যেমন ভাবে যখন ডাকে তখনই তো তার কাছে যাই—এই যেমন তোমার ডাকে এলাম।

ছেলেটা অবাক হোয়ে তার দিকে চেয়ে আছে।

এমন রূপ মানুষের তো কোনোদিন দেখেনি সে।

ছেলেটি দেখলে তার সারা গা দিয়ে ঘাম ঝরছে। কপাল থেকে শুরু কোরে দুই পা দিয়ে যেন সে ঘাম বয়ে চলেছে।

—একটু দাঁড়াওনা তুমি।

—কেন ?

—বড্ড ঘামছো তুমি, তোমার ঘামটা মুছিয়ে দি।

ছেলেটা তার গামছা দিয়ে আগে পা দুটো মোছাতে লাগলো।

সে স্পর্শে ছেলেটার সারাদেহে যেন একটা শিহরণ বয়ে গেলো।

অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলো গাছতলায়।

যখন জ্ঞান হোল তখন চারপাশে অন্ধকার ছেয়ে গেছে। গরুর পাল সব বাড়ী ফিরে গেছে।

ছেলেটা অন্ধকারে কিছুই দেখতে পায়না—শুধু এক হাতছানি তাকে যেন ইশারা করে। সারা দেহে মনে যেন একটা আর্ত হাহাকার ছড়িয়ে যায়—পেয়ে হারালাম। সে কোথায় গেলো? এইতো আমি তার পা মুছিয়ে দিলাম। বার বার দুহাত মাথায় রাখে। আমতলার মাটিতে কেঁদে গড়াগড়ি যায়। ধুলো মাখে সারা গায়।

তারপর ধীরে ধীরে উঠে সোনাই নদীর ধার দিয়ে যে এক-পেয়ে রাস্তাটা চলে গেছে, সে রাস্তা দিয়ে হাঁটা শুরু করে।

অন্ধকারাচ্ছন্ন পৃথিবী।

ঐ কালো ছেলেটার রঙ যেন ছড়িয়ে আছে সর্বত্র। সোনাই নদীর জলও কালো। আশপাশের বনবাদড়ও কালো রঙ ধরেছে।

কৃষ্ণও তো কালো, এই কালোর মাঝেও তো তাঁর বসতি হোতে পারে।

এই ঘন অন্ধকারের আঁচল ধরে ধরে চলেছে এক কৃষ্ণপ্রেমিক কৃষ্ণ প্রেমের সন্ধানে। কত পথ তাকে যেতে হবে তাও সে জানেনা, কোথায় গিয়ে সে থামবে তাও জানেনা—শুধু জানে তাকে চলতে হবে, তাকে পেতে হবে পরমধন। দেখা দিয়ে যে লুকিয়েছে তাঁকে না ধরা পর্যন্ত তার বিশ্রাম নেই। সোনাই নদীর ঢেউ যেন সুর তুলে বয়ে যায়।

যেন বলে ঃ—এগিয়ে যাও, পাবে।

অন্ধকারে কি একটা পাখী কিচির মিচির কোরছে যেন বোলছে ঃ—যে পথ ধরেছ, এই পথেই তাঁর দেখা পাবে।

গাছের পাতা অন্ধকারে দোলে।

যেন মাথা নাচিয়ে বলেঃ একভাবে চলো তোমার অভাব থাকবে না।

সোনাই নদীতে একটা নৌকা বুঝি চলেছে।

নৌকার মাঝির গান ভেসে আসে—

"থাকতে বেলা ও মন ভোলা গাওরে হরিনাম।
গাওরে হরিনাম ভোলামন গাওরে হরিনাম ॥
ভবে আসবার কালে বলে এলে এবার গাইব হরিনাম
রিপুর ফাঁদে হলি বদ্ধ বিধি হোল তোর বাম
বিচার করে দেখলি না তুই এর কি পরিণাম।
যেখান হতে এলে ভবে সেই তো তোমার আপন ধাম॥
যাবার আগে চাওরে ক্ষমা করবে সবে প্রণাম
নিতাই মাঝির ঘাটে বাঁধা আছে যাবার যান।
পারের কড়ি কেবলমাত্র মুখে মধুর হরিনাম।
হরে কৃষ্ণ হরে নাম মন বল মুখে অবিরাম ॥"

ছেলেটা এগিয়ে চলেছে।

পেছনে পড়ে রইল সব কিছু। সব ছেড়ে সে বুঝি এক ধরেছে তাই আজ তার কোন বাঁধন নেই।

যে ছেলেটা একা একা অন্ধকারের পথে যাত্রা কোরছে তিনি পরবর্তীকালের মহান সাধক ঠাকুর হরিদাস। যশোহর জেলার বুঢ়ন পরগনায় ভাটকলাগাছি গ্রামে স্বর্ণ নদীর তীরে ইনি অবতীর্ণ হোয়েছিলেন। যে স্বর্ণনদী আজ সোনাই নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। ঠাকুর বৃন্দাবনদাস এঁকে যবন কুলে অবতীর্ণ বোলেছেন। পরলোকগত ঐতিহাসিক সতীশচন্দ্র মিত্র তাঁর যশোহর খুলনার ইতিহাসে উল্লেখ করেছেন যে ঠাকুর হরিদাস ব্রাহ্মণ কুলে

জন্মগ্রহণ করেছিলেন তাঁর মাতার নাম ছিল গৌরী। কৈশোরেই ঠাকুর হরিদাস পিতামাতাকে হারান ও এক মুসলমান এঁকে তার ঘরে নিয়ে গিয়ে লালন পালন করেন। মুসলমানের ঘরে প্রতিপালিত বোলে ইনি যবন হরিদাস নামে খ্যাত হন। সতীশ চন্দ্রের উক্তির কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

এবার আমাদের ফিরে যেতে হ'বে ঠাকুর হরিদাসের সন্ধানে যিনি একা একা পথ বেয়ে গেলেন। যুগ যুগ ধরে উনি বুঝি এমনি ভাবে একাই পথ চলছেন—একা পথ চলতে যে জানে সেই বুঝি জানে আর একের সন্ধান। জন্ম জন্মের সুকৃতি না থাকলে এরকম কৃষ্ণভক্ত হয় না।

"সর্বত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন।
কৃষ্ণসুখ হেতু করে প্রেমসেবন॥
ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণে দৃঢ় অনুরাগ।
স্বচ্ছ ধোতবস্ত্রে যৈছে নাহি কোন দাগ॥
কৃষ্ণলাগি আর সব করি পরিত্যাগ।
কৃষ্ণসুখ হেতু করে শুদ্ধ অনুরাগ॥"

ঠাকুর হরিদাস সেই কৃষ্ণের জন্য সব ত্যাগ করেছেন। কৃষ্ণ ধ্যান কৃষ্ণজ্ঞান, কৃষ্ণমন যার হয় সেই তো পায় কৃষ্ণদরশন। ঠাকুর হরিদাস সেই পথের পথিক যে পথে কৃষ্ণপদছায়া আছে। কলিতে মহৌষধ কি? কৃষ্ণনাম! সেই কৃষ্ণ নামের সুরা পান কোরে যে মাতাল হোতে পারে, অপরকে মাতাল করতে পারে সেই জানে নামের মহিমা। সেই নামের নামাবলী সারা দেহে মনে জড়িয়ে পথ চলেছে ঠাকুর হরিদাস নামীর সন্ধানে।

তারপর কেটে যায় অনেকদিন।

হরিদাস ঘুরতে ঘুরতে বেনাপোল এলেন। যায়গাটা খুব

নির্জন ভেবে তিনি সেইখানে একটা কুটির নির্মাণ কোরে সেইখানে হরিনামে মেতে উঠলেন। সারা দিন রাত্তে তিনলক্ষ নাম করেন। তিনলক্ষ হরির নাম যিনি কোরতে পারেন তিনি যে সাধারণ মানুষ নন এটা বেশ বোঝা যায়। আহার নিদ্রার কথা তাঁর যেন মনেই থাকে না। এমন মধুমাখা হরিনামে তাঁর ক্ষুধা তৃষ্ণা সবই বুঝি দূর হয়ে যায়।

তিনি মাথা মোড়ালেন, গলায় দিলেন তুলসীর মালা। সারা দিন নামকীর্ত্তনেই একরকম তাঁর কেটে যায়। সন্ধ্যার কিছু আগে তিনি ভিক্ষা কোরে যা পান তাতেই কোনমতে ক্ষুধা নিবৃত্তি করেন। হরিনামামৃত সুধা জ্ঞান কোরেই যাঁর দিন কাটে তাঁর আবার ক্ষুধা কোথায় ? যাঁর নাম নিলে ক্ষুধা তৃষ্ণা থাকেনা সেই শ্রীহরির যিনি দাস তাঁকে কাবু করে কে ?

"মাথা মুড়ি একবস্ত্রে রহিল সেই ঘরে।
রাত্রি দিনে তিনলক্ষ নাম গ্রহণ করে॥"

নির্জন বনানীর মাঝে এক পর্ণকুটিরে ঠাকুর হরিদাস তন্ময় হোয়ে থাকেন হরিনাম সংকীর্ত্তনে। সারাদিনে তিনি কখনও কখনও কয়েকটা তুলসীর পাতা খান। কৃষ্ণপ্রেমে মজলে বুঝি এমনিই হয়। সারা পৃথিবী যেন ভুল হোয়ে যায়। কোথায় সংসার, কোথায় পুত্র কন্যা, কোথায় আত্মীয় বান্ধব সবই তো একজন। তাঁকে চিনলে সব চেনা হোয়ে যায়, তাঁকে জানলে সব জানা হয়, তাঁকে দেখে তো সব পাওয়া হোয়ে যায়, এই যে মহাপ্রেম। এ পেতে হোলে বাঁধন খুলতে হবে। ভববন্ধন না খুললে তো ভবপারের মাঝিকে পাওয়া যাবে না। কলির জীব মায়াতে বাঁধা পড়ে দিনরাত হাবুডুবু খাচ্ছে। এ মায়া-রাক্ষসদের হাত থেকে নিস্তার তো মিলছে না। সারা জন্ম অনিত্য

জিনিষ নিয়ে জীব ঘুরে বেড়াচ্ছে। যা চিরকাল থাকবেনা, যার কোন স্থায়িত্ব নেই তার প্রতি জীবের টান বেশী। তাইতো দুঃখ সাগরে ভাসছে "সারা দেহ জীবের, বিষে নীল হোয়ে গেলো— বিষয় বিষ, সংসার বিষ।" এ দুই বিষে জ্বলে পুড়ে ভুলে রইল সেই পরম করুণাময় শ্রীহরিকে। তবে কৃষ্ণপ্রেম কি কোরে হবে—

"বিষয় থাকিতে কৃষ্ণপ্রেম নাহি হয়।
'বিষয়ীর দূর কৃষ্ণ জানিহ নিশ্চয়॥
বিষয়ি আবিষ্ট মন বড়ই জঞ্জাল।
স্ত্রীপুত্র মায়াজাল এই সব কাল॥
দৈবে কোন ভাগ্যবান সাধু সঙ্গ পায়।
বিষয় আবেশ ছাড়ি কৃষ্ণয়ে ভজয়॥"

ঠাকুর হরিদাস সবছেড়ে বড় বিষয়ের জমি রেজিষ্টারী কোরতে বসেছেন সাধন ভজন দিয়ে। এ বিষয়ের দখল একবার পেলে আর তা বেদখল হবে না। সেই নিষ্ঠারই সাধনা চলছে বেনাপোলের এই নির্জন কুটিরে। "বনফুল বনেই ফোটে। তার গন্ধে আকৃষ্ট হোয়ে মানুষ আসে তার রস আস্বাদন কোরতে।" গাছকে যেতে হয় না কারও কাছে।

তাঁর এই সাধন ভজন দেখে গ্রামের মানুষ আকৃষ্ট হয়। ফাঁক পেলেই তারা ছুটে আসে এই কুটিরে। হরিদাসকে মুসলমান জেনেও সকলে তাঁকে ভক্তি শ্রদ্ধা করে। ব্রাহ্মণ শূদ্র সবাই এসে তাঁকে প্রণাম করে। কখনও কখনও কেউ বা এসে তাঁর সাথে হরিনাম করে।

প্রতি সন্ধ্যায় গ্রামের কীর্তনীয়ারা এসে নাম শুনে মাতিয়ে রাখে এই পর্ণ কুটির। হরিদাস একমনে বসে নাম জপ করেন আর চোখের জলে বুক ভাসান।

গ্রামের লোক সবাই যেন হরির নামে মেতে ওঠে

ঠাকুর হরিদাসের এই হরিভক্তির কথা দেখতে দেখতে আশপাশের গ্রামেও ছড়িয়ে যায়। পর্ণকুটির হোয়ে ওঠে এক মহাতীর্থস্থান।

যেখানে হরির নাম সেখানেই তো তাঁর অধিষ্ঠান।

নামের মাঝেই তো নামীর প্রকাশ। নামের মাঝেই তো তাঁর স্থিতি।

মুসলমানের পদধূলিস্পর্শে ধন্য হোচ্ছে সবাই দেখে গ্রামের কয়েকজন ব্রাহ্মণ বিরুদ্ধ প্রচারে লেগে গেলো।

কেউ কেউ বোললে ঃ—এসব কি অনাচার চলছে গ্রামে? সবাই গিয়ে মুসলমানের পাদ্‌দোক গ্রহণ কোরছে। মুসলমান ধর্মাবলম্বী হোয়ে সে সাধন ভজনের কি জানবে! গ্রামের লোকও মত্ত হোযে অনাচারে ইন্ধন যোগাচ্ছে, এর ব্যবস্থা না কোরলে হিন্দুধর্মের মহা অনর্থ ঘটবে।

আবার কেউবা বোললেন—যে ভাবে ঐ যবন বেটা আখড়া বসিয়েছে তাতে তো আমাদের আর কেউ মানবে না। বেটাকে এখান থেকে উৎখাত করার ব্যবস্থা করা হোক তা না হোলে এ গ্রামে তারা আর বাস কোরতে পারবে না।

ঠাকুর হরিদাসের কানেও এসব কথা কিছু কিছু যায়।

তিনি হাসেন আপন মনে। ব্রাহ্মণ হোয়ে যারা কৃষ্ণনামে পাগল হয় না তারা অতি অধম। তাদের পাপের কোন সীমা নেই।

"উত্তম কুলেতে জন্মি শ্রীকৃষ্ণ না ভজে।
কুলে তার কি করিবে নরকেতে মজে॥"

হরিদাস মনে মনে শ্রীহরির কাছে প্রার্থনা জানান—প্রভু

ওদের মানুষ করো। শ্রেষ্ঠকুলে জন্মে এরা অমানুষ হোয়েই রইল। এদের তুমি বাঁচাও। এরা সৎ পথে না এলে তোমার নাম প্রচার হবে কি কোরে? এদের উদ্ধারের জন্যই তো এবার তোমার আসা। এদের ভক্তি দাও, প্রেম দাও।

ঠাকুর হরিদাস বালকের মত কাঁদছেন আর হরি হরি বোলছেন—

"এই সকল রাক্ষস ব্রাহ্মণ নাম মাত্র।
এই সব জন যম যাতনার পাত্র॥
কলিযুগে রাক্ষস সকল বিপ্রঘরে।
জন্মিবেক সুজনের হিংসা করিবারে॥"

হে প্রভু! করুণাসিন্ধু তোমার নামগান কোরতে কোরতে এ দেহ যেন শেষ হয়। তোমার দেখা পাই না পাই তাতে ক্ষতি নেই—সে পুন্য না থাকলে হ'বে কি কোরে? শুধু এই শক্তিতে শক্তিমান করো যেন তোমার নাম কোরতে কোরতেই প্রাণ বের হয়। এ কামনাটুকু আমার পূর্ণ করো তাহলেই বুঝবো এ জন্ম আমার ব্যর্থ হোলনা।

বেনাপোলের জমিদার রামচন্দ্র খান ভয়ানক বৈষ্ণববিদ্বেষী।

হরিদাসের সুখ্যাতিতে তার দেহে মনে জ্বালা ধরে। ঠাকুর হরিদাসকে অপমানিত কোরবার নানা ফন্দী আটলো। তারই জমিদারিতে বাস কোরে তাকে অবজ্ঞা কোরে এক যবনের পর্ণ-কুটিরে সবাই ছুটেছে। গ্রামের কিছু কিছু ব্রাহ্মণ এই কাজে তার সহায় হোলেন। রামচন্দ্র খানের সংগে পরামর্শ কোরে তারা মতলব কোরলেন হরিদাসকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারতে হ'বে। প্রতিদিন সেখানে কীর্তন হয়। কীর্তন শেষে যখন সবাই চলে যাবে তখন হরিদাসের ঘরে আগুন লাগিয়ে দিতে হ'বে।

ঠাকুর হরিদাস নাম কীর্তনে বিভোর।

নামই তিনি সম্বল কোরেছেন—তাই সেদিনও তিনি কীর্তন শেষে নিজের কুটিরে বসে নাম গান কোরছেন আর কৃষ্ণ কৃষ্ণ বোলে কাঁদছেন।

রাত্রি বেড়ে চলছে। অন্ধকার রাত।

ষড়যন্ত্রকারীরা বেরিয়ে পড়েছে পাপ কাজ সমাধা কোরবার জন্য—

অন্ধকার পথ। গ্রামের মানুষ সবই বোধ হয় ঘুমে অচেতন ঘুম নেই শুধু পাপীদের।

একই মানুষ—

কেউ ঘর বাঁধবার জন্য সাহায্য করে, আবার কেউ ঘর পোড়াবার জন্য তাতে আগুন লাগায়। মানুষের পৃথিবীতে এরা মানুষ নয় এরা পশু। কোথা থেকে আকাশ জুড়ে মেঘ ওঠে। বিদ্যুৎ চমকায়। ঝড়ো হাওয়া ওঠে। ঘন ঘন মেঘ গর্জনে আকাশ কেঁপে ওঠে।

চলেছে ওরা আর একটু গেলেই হরিদাসের কুটির।

দূর থেকে শোনা যাচ্ছে ঠাকুর হরিদাস নাম কীর্তন কোরছেন।

তাঁর কি কোন ভ্রূক্ষেপ আছে—যাঁর আশ্রয় তিনি নিয়েছেন সেখানে ভয় কোথায়? নির্ভয় যিনি তাঁরই পক্ষপুটে তিনি মুখ ঢেকে বসে আছেন। ঝড় আগুন তাঁর কি কোরবে?

হোল না আর আগুন দেওয়া। প্রচণ্ড ঝড়ের সাথে বৃষ্টি নামে অঝোর ধারায়। পট পট কোরে ডাল ভেঙে পড়ে পথের ওপর। একজনের কপালে এসে একটা ডাল ছিটকে পড়ে আর সবাই ছুটছে যে যার বাড়ীর দিকে। কোথায় বাড়ী, কোথায় ঘর!

যে কজন গিয়েছিল তাদের প্রত্যেকেরই ঘর পড়ে গেছে। তারা এখন সম্পূর্ণ নিরাশ্রয়।

একজনের আশ্রয় যারা কেড়ে নিতে চায় তাদের তো নিরাশ্রয় হোতেই হবে। ঠাকুর হরিদাস নির্বিকার।

কোথা দিয়ে কি হোয়ে গেলো তিনি কিছুই জানতে পারলেন না। পরম করুণাময় ভগবান এমনি ভাবেই মানুষকে রক্ষা করেন। বিপন্নপালক ভগবান। পরিত্রাতা ভগবানের এ লীলা বোঝে কার সাধ্য।

তাই তো তিনি বোলছেন সবাইকে ডেকে—

হরিনাম কর, হারিনাম শ্রবণ কর, হরিনাম জপ কর, হরিনাম কীর্তন কর। কলিতে যাগযজ্ঞর কোন প্রয়োজন নেই—কলিতে শুধু নামই সার। এই নাম ছাড়া কলির জীবের অন্য গতি নেই।

"কৃষ্ণমন্ত্র হৈতে হবে সংসার মোচন।
কৃষ্ণনাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ॥
নাম বিনা কলি কালে নাহি আর ধর্ম।
সর্বমন্ত্রসার নাম এই শাস্ত্রমর্ম॥"

নিরাশ্রয়ী ব্রাহ্মণরা আরো জ্বলে উঠলেন।

যে ভাবে হোক ঐ ভণ্ডটাকে বেনাপোলের মাটি ছেড়ে চলে যেতেই হ'বে। ওদের ভিতরে একজন কিন্তু ভাবছে—এ কি কোরে সম্ভব হোল। হরিদাস সাধারণ মানুষ নয়। তা না হোলে মেঘ শূন্য আকাশে মেঘ আসে কোথা থেকে—অন্যায় কাজের শাস্তি ভগবান হাতে হাতেই দিয়েছেন তাকে। কপাল ফেটে গেলো, ঘর পড়ে গেলো, কিন্তু হরিদাসের তো কিছুই হোলনা। ঐ তো পাতার কুটির যা একটু হাওয়াতেই মাটিতে মিশে যেতে পারে তা কি কোরে রক্ষা পেলো।

ভগবান যাকে রক্ষা করেন তাকে বুঝি এমনি ভাবেই রক্ষা করেন।

অনুশোচনায় তার সারা দেহ জ্বলে পুড়ে যায়।

সঙ্গীদের ছেড়ে তিনি চুপি চুপি চলে আসেন হরিদাসের কুটিরে।

তিনি তখন নামে বিভোর।

কোনদিকে না তাকিয়ে সেই ব্রাহ্মণ হরিদাসের পা ধরে ক্ষমা চাইল।

হরিদাস হাসলেন।

—ঠাকুর আমি মহাপাপী, আমাকে দয়া করো!

ঠাকুর শুধু বোললেন—নাম করো তোমার পাপ ধুয়ে মুছে যাবে। এই নামের ভিতরই তো নামীর বসতি—নাম কোরতে কোরতে তাঁর আশ্রয় পাবে।

"পশুপক্ষী কীট যদি বলিতে না পারে।
শুনিলে সে হরিনাম তারা সব তরে॥"

হে কৃষ্ণ করুণাসিন্ধু—কৃপা করো প্রভু। মায়ার খোলস তুমি খুলে দাও। মায়ায় যে সারা দেহ মন আচ্ছন্ন। চোখের তুলি আর কতকাল লাগিয়ে রাখবো। একটু কৃপা কোরে তোমাকে দেখতে দাও। আর কতদিন খুঁটিতে বেঁধে রাখবে। খুলে দাও এ বন্ধন। তোমার কাছে ছুটে যাই। মিথ্যে খেলায় জীবন কেটে গেলো—এবার আমাকে তোমার দলে নাও আমাকে তুমি নিশ্চিন্ত করো। তোমার শ্যামতনু দেখবার জন্য মন বড় ব্যাকুল হোয়েছে। তোমার মুখের মিষ্টি হাসি, ত্রিভঙ্গরূপ, বাঁকা চাহনি অধরে বেনু আর মাথার চুড়ায় ময়ুর পাখা, রাঙা পায়ে সোনার নুপুরের নিক্কন—আমি কি দেখবোনা-শুনবোনা।

ওগো কাঙালের ঠাকুর আমাকে তুমি তোমার কোরে নাও। আমার মাঝে তোমার বসতি হোক। প্রেম ভক্তির সন্ধান আমাকে দাও। মহাকাল আমার সিয়রে বসে অট্টহাসি কোরছে। আমি তো সংসার মধুতে মত্ত হোয়ে আছি। এ সংসারে আর আমার প্রয়োজন নেই এবার তোমার সংসারে আশ্রয় দাও—যেখানে বসে আমি নিশ্চিন্ত মনে তোমার নাম গান কোরতে পারি।

যতদিন যায় ততই হরিদাসের কুটিরে লোকসমাগম হয়।

হরিদাসকে সবাই দেবতার মত পূজো করে। নিত্য সন্ধ্যায় গ্রামের মেয়ে পুরুষ ভীড় করে। সকলে মিলে আনন্দে হরিনাম করে।

জমিদার রামচন্দ্র খান এবার নতুন ছিদ্র খুঁজে পেলেন।

এবার আর যবনের নিস্তার নেই। এবার তার সব কিছু ধুলোয় মিশে যাবে। তাঁর নাম যাতে আর কেউ না করে, তাঁর নামে সবার মনে যাতে ঘৃণার উদ্রেক হয় সেই ব্যবস্থাই তিনি কোরেছেন।

সুন্দরী অপরূপ রূপবতী বারাঙ্গনাদের নিমন্ত্রণ কোরে আনলেন রামচন্দ্র খান। তিনি বোললেন—তোমরা এই হরিদাসের বৈরাগ্য ধর্ম নাশ করো। তোমাদের আমি প্রচুর পুরস্কার দেবো। কলংকের কালিমা লেপে দিতে হ'বে তাঁর সারা অঙ্গে। যে ভাবে হোক তাঁকে ভুলিয়ে তাঁর ধর্মনাশ কোরতে হবে। শহরের শ্রেষ্ঠ বারাঙ্গনা তুলসী।

যেমন বয়স, তেমনি তার রূপ। প্রশস্ত আননে ছোট একটা কৃষ্ণতিল, বাঁকা কালো হরিণ চোখ। কাজল কালো চোখের ভ্রু, বাঁশীর মত নাক। পীনোন্নত বক্ষ, সারা দেহে তার উদ্দাম যৌবনের সমারোহ।

তুলসী বোললে—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন আমি তিনদিনেই তাকে নিজ বসে আনবো—রূপের আর দেহের কারবার আমার। আমি তাকে পাগল কোরে দেবো তারপর কোরব তার ধর্ম্মনাশ।

উল্লসিত হোয়ে উঠলেন রামচন্দ্র খান।

বোললেন ঃ—বেশ আমার লোক তোমার সঙ্গে যাবে তোমার সঙ্গে তাকে ধরে আনবে।

তুলশী হেসে বলে ঃ দরকার নেই আমি প্রথম দিন গিয়ে তার সঙ্গ লাভ করি তারপর দ্বিতীয় দিনে আপনার লোক সঙ্গে নিয়ে যাবো।

রামচন্দ্র খান। নরদেহে পশুর স্বভাব তার। হিংসা আর দ্বেষ তার যেন তুঙ্গে উঠেছে। একবার তাঁর ধর্ম্মনাশ যদি কোরতে পারে ঐ বারাঙ্গনা তারপর তার কুটির ভেঙে ঐখানে চষে দেবেন যাতে তাঁর কোন অস্তিত্বই না থাকে।

রামচন্দ্র খান আবেশে তুলশীর হাত জড়িয়ে ধরে বোললেন ঃ বড় অপমানিত হোয়েছি আমি তুমি আমার মান রক্ষা করো।

তুলশী হেসে জবাব দেয় ঃ—আপনি নিশ্চন্ত থাকুন।

মনে মনে বারাঙ্গনা ভাবে—

তার রূপে পাগল হয়নি এমন লোক এদেশে একটাও নেই! কতজন তার সঙ্গে একটু আলাপ কোরবার জন্য কত টাকা কত গহনা দিয়ে গেছে। কত লোক তার একটু মিষ্টি হাসি দেখতে পেলে ধন্য হোয়ে যায় আর এ তো এক যবন তপস্বী। কে জানে হয়তো লোকচক্ষুর অন্তরালে কত গৃহস্থ বধূর সতীধর্ম্মনাশ কোরেছে তার কোমল হাতের পরশ পেলে ঐ রকম কতো হরিদাস গড়িয়ে পড়বে। বারাঙ্গনা তুলশী একটু হাসলে আপন মনে।

রূপ যার আছে তার জয় অবশ্যম্ভাবী।

হরিদাসের কুটিরে কীর্ত্তন শেষ হয়।

ওদিকে তুলশী সাজছে অভিসারিকার সাজে।

দেহ মন সব আজ সে উজাড় কোরে ঢেলে দেবে প্রেমিকের কাছে।

পরনে আজ তার পাতলা একটা শাড়ী। বুকে জড়িয়েছে অপরূপ কাঁচুলি তার ওপর পাতলা একটা জামা। পীনোন্নত বক্ষ পরিষ্কার হোয়ে ফুটে উঠেছে। কপালে দিল কুমকুমের টিপ দুচোখে মাখলো কাজল। ঠোঁটে দিল রঙ, হাতের চাঁপারকলির মত আঙুলে দিল মেহেদি রঙ, মাথার খোঁপায় দিল এক গুচ্ছ গোলাপ। গলায় দিল সুগন্ধী বেলফুলের মালা। সুগন্ধী আলতায় রাঙালো দুই পা। সারা গায়ে ছিটিয়ে দিল সুগন্ধী আতর।

বার বার দর্পনে দেখতে লাগলো তার মুখ।

এমন রূপেও হরিদাস মজবে না ?

অতি অন্তর্পনে তুলশী রজনীর অন্ধকারে হরিদাসের দুয়োরে এসে নমস্কার কোরলো।

হরিদাস নাম কোরছেন।

অমৃতক্ষরা মধুমাখা হরিনাম।

তুলশী অঙ্গের কাপড় হাঁটুর ওপর তুলে দিল, বুকের কাপড় ফেলে দিয়ে তার সামনে বসে রইল।

হরিদাস তাকাচ্ছেন না। আপন মনে নাম কোরে চলেছেন।

তুলশী মিষ্টি সুরে বোললেঃ—ঠাকুর তোমার রূপে আমি পাগল হোয়েছি—তোমার এমন যৌবন এমন সুকোমলকান্তি চেহারা দেখে কোন নারী ঠিক থাকতে পারে, তোমাকে আমার এ দেহ দান কোরবার জন্য উন্মত্তা হোয়েছি। মনে হোচ্ছে

তোমাকে না পেলে আমার এ জীবন বাঁচবে না। তুমি আমাকে বাঁচাও।

হরিদাস কহে তোমা করিব অঙ্গীকার।
সংখ্যা নাম সমাপ্তি যাবৎ না হয় আমার ॥
তাবৎ তুমি বসি শুন নাম সংকীর্ত্তন।
নাম সমাপ্তি হৈলে করিব তোমার মন ॥

তুলশী বসে আছে।

হরিদাস নাম কীর্ত্তন কোরছেন। তুলসী দোরের সামনে বসে এক মনে শুনছে তাঁর গান। একাগ্রচিত্তে অত্যন্ত ভক্তিভরে তুলশী সেই নামামৃত পান কোরছে। রাত্রি বাড়ছে—তুলশী ভাবে এই বুঝিনাম শেষ হয়, এই বুঝি তার মনের বাসনা পূর্ণ হয়। কিন্তু রাত্রি বেড়ে চলে সমানে।

ধীরে ধীরে অন্ধকার পাতলা হয।

পূর্বদিক ফরসা হোয়ে আসে।

নীড় ছেড়ে পাখীরা সব বের হয়।

রাত পোহাল।

বারাঙ্গনা তুলশীর ও জীবনে অনেক রাত জেগে কাটাতে হোয়েছে কিন্তু আজকের রাত্রি জাগরণ যেন অন্য ধরনের।

ধীরে ধীরে তুলশী উঠলো।

আর কিছু না বলে সে চলে গেলো রামচন্দ্র খানের কাছে।

সবকিছু নিবেদন কোরে সে বোললেঃ—আজ সে কথা দিয়েছে আমার মনোবেদনা পূর্ণ কোরবে।

রামচন্দ্র খান বললেনঃ—বেশ তাই হোক।

দ্বিতীয় দিনের রাত্রি।

তুলশী আজ আবার তার বেশ পরিবর্ত্তন কোরেছে। আর

এক অপরূপ সাজ আজ তার। ধীরে ধীরে তুলশী গিয়ে বসলো হরিদাসের দোরে।

হরিদাস তাকে দেখে ভাবে গদগদ হোয়ে বেললেন ঃ—আমার সব দোষ ক্ষমা করো কাল তোমার কথা আমি রাখতে পারিনি। এসেছো ভালই হয়েছে, আমিও ভাবছিলাম তুমি কবে আসবে।

তুলশী একথা শুনে পুলকিতা।

ভাবলো হরিদাস নিশ্চয়ই তার প্রেমে পড়েছেন।

হরিদাস একটু হাসলেন ঃ—তুমি বসে বসে আমার নাম কীর্ত্তন শোন, তারপর নাম শেষ হোলে তোমার কথা রাখবো।

তুলশী হাসে ঃ—বেশ তাই হবে।

হরিদাস নামে ডুবে যান।

তুলশীও হরি হরি বোলে আনন্দে আত্মহারা হোয়ে দোরে বসে থাকে।

ভাবছে এবার মাছ বোধহয় টোপ গিলেছে।

ঠাকুরকে গিলতে পারলে জমিদার বাবু তাকে প্রচুর পুরস্কার দেবেন। সেই টাকাতে এবার একটা ভাল গহনা গড়তে হবে। একখানা সোনার জরি দেওয়া বেনারশী শাড়ীও তার অনেকদিনের সাধ। এবার সব আশা পূরণ হবে।

রামচন্দ্রবাবুকে মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে আরও কিছু জিনিস নিতে হবে।

এদিকে রাত্রি বাড়ছে।

ঠাকুর নাম কোরছেন তার দুচোখ দিয়ে অবিরাম জল গড়াচ্ছে।

তুলশী দেখছে আর ভাবছে, ঠাকুরনাম কোরছেন অথচ তিনি

কাঁদছেন কেন। যাঁকে চাই তাঁকে পেতে হোলে এমনি কোরেই বুঝি কাঁদতে হয়। কাঁদলে বোধহয় তিনি কৃপা করেন। তবে সে এতদিন কি কোরল ? দেহ নিয়ে ছিনিমিনি খেলা আর ঐশ্বর্য্য নিয়ে তন্ময় থাকে। এ ছাড়া তো আর কিছুই সে করেনি। ঈশ্বরের দেওয়া এমন পবিত্র দেহ তা সে ঘরের ঠাকুরকে ছেড়ে পথের কুকুরকে বিলিয়ে দিল। তার এ পাপ দেহ কোন কাজে লাগবে। জীবযোগ বা দেবযোগ কোনটাতেই তো লাগবে না। তবে তার কি হবে।

আবার ভাবছে—দূর এ সব কি সে ভাবছে, রাত্রি তো আজও প্রায় শেষ হোয়ে এলো।

এ কামাতুর দেহ নিয়ে আর কতক্ষণ বসে থাকবে।

তুলশী যেন অস্থির হোয়ে উঠে।

একবার উঠছে একবার বসছে সারা দেহে এক চঞ্চলতা।

হরিদাস তখন বোললেন ঃ—এক মাসে এককোটি নাম জপ কোরব এই আমার ব্রত ছিল। ভেবেছিলাম আজই তা শেষ হবে কিন্তু সমস্ত রাত্রি নাম কোরেও শেষ হোল না। কাল অবশ্যই আমার এক কোটি নাম জপা শেষ হবে। ব্রত শেষ হলে তোমার সঙ্গ অবশ্যই গ্রহণ কোরব।

তুলশী তাঁর দিকে অবাক বিস্ময়ে চেয়ে আছে।

হরিদাস বোললেন ঃ—তোমার মনের অবস্থা আমি বুঝতে পারছি—তোমার সঙ্গ লাভ কোরবার জন্য আমিও ব্যাকুল হোয়েছি। আর একটা দিন তুমি একটু ধৈর্য্য ধরো—তোমাতে আমি ডুবে যাবো।

হরিদাস ভাবাবেশে কেমন ধারা যেন হোয়ে গেলেন।

হরিদাস বোললেন ঃ—তোমার মাঝেই তো আমার শ্রীহরির

বাস, তোমার রূপের মাঝেই তো শ্রীরাধার ভাব। দুইভাবে তোমার মধ্যে যে এক হোয়ে অধিষ্ঠান হয়েছে। তোমার দেহ তো বৃন্দাবন। তুমি আজ আবার অবশ্যই এসো ঐ বৃন্দাবনের রজ আমি সারা দেহে মেখে ধন্য হবো।

তুলশী পর পর দুই রাত্রি জাগরণে যেন ক্লান্ত হোয়ে পড়েছে।

কোনমতে ক্লান্ত চরণে জমিদারের কাছে গিয়ে নিবেদন কোরল যে আজ ব্রত শেষে ঠাকুর তার সঙ্গ কোরবে।

রামচন্দ্র যেন বিরক্ত হোলেন ঃ—এসব কি তুমি বোলছ, তোমার এমন রূপ দু-দুটো দিন চলে গেলো তবুও তাকে ভুলাতে পারলে না।

তুলশী কথা বললে না।

রামচন্দ্র বললেন ঃ—আমার মনে হয় এতদিন যা কোরে এসেছো পয়সার লোভে। সে সব তো খেলা। এবার বোধহয় সত্যি সত্যিই মনের মানুষ পেয়েছো আর মনে হয় সত্যিকারের প্রেমে এবার তুমি পোড়েছ।

একটু থেমে বোললেন ঃ—যাই হোক আমার মান এ যাত্রায় বাঁচিয়ে দাও।

তুলশী ধীরে ধীরে বোললে ঃ—হ্যাঁ জমিদার বাবু। আপনি মিথ্যে বলেননি—প্রেম কাকে বলে তা এতদিন জানিনি এবার বোধহয় জানলাম।

—শেষে তুমি একটা যবনের·········

তুলশী হেসে চলে গেলো।

কে জানে মনের গোপন তারে তার ঘা লেগেছে। কে জানে তার মনের কোন সরোবরে উঠেছে ছোট একটা ঢেউ।

তৃতীয় দিনের রাত।

তুলশী আজ আবার এসেছে আজ সাজ সজ্জার তেমন কোন জৌলুষ নেই।

শুধু জমিদার বাবু কি ভাববেন ভেবে কোনরকম একটু অঙ্গসজ্জা কোরেছে।

আজ তুলশী এ ঠাকুরকে প্রণাম কোরে হরি হরি বোলে উঠলো।

হরিদাস হাসলেন।

ঠাকুর বোললেনঃ—আজ আমার ব্রত শেষ হবে। এক কোটি নাম জপের আজই শেষদিন। তুমি আর অধীর হোয়না—আজ নাম শেষ হোলে তোমার কামনা পূর্ণ কোরব।

আজও কীর্ত্তন কোরতে কোরতে রাত্রি শেষ হোল।

হরিদাস প্রণাম জানালেন শ্রীহরিকে।

উচ্চৈ স্বরে বোলে উঠেন সুর কোরে—

এক কৃষ্ণ নামে করে পূর্বপাপ নাশ।
প্রেমের কারণ ভক্তি করেন প্রকাশ॥
প্রেমের উদয়ে হয় প্রেমের বিকার।
স্বেদ কম্প পুলকাদি গদগদাশ্রুধার॥
অনায়াসে ভবক্ষয় কৃষ্ণের সেবন।
এক কৃষ্ণনামের ফলে পাই এত ধন॥
হেন কৃষ্ণ নাম যদি লয় বহুবার।
তবে যদি প্রেম নহে নহে অশ্রুধার॥
তবে জানি অপরাধ তাহাতে প্রচুর।
কৃষ্ণনাম বীজ তাহে না হয় অঙ্কুর॥

হরিদাস তাকালেন তুলশীর দিকে।

তুলশীর কপাল বেয়ে নেমেছে শ্রাবণের ধারা চোখের সমুদ্রে ডেকেছে সব ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়ার বন্যা। দেহমনে লেগেছে কম্পন। আলুয়িত কেশে লেগেছে ঝড়ের নাচন। চোখের কাজল হোয়েছে কৃষ্ণাঞ্জন। দেহের কাম রূপান্তরিত হোয়েছে অপরূপ প্রেমে।

হরিদাস হাত বাড়ালেন হাসতে হাসতে ঃ—এসো রাত যে শেষ হোঁয়ে গেলো।

কাঁপছে ঐশ্বর্যশালিনী বারাঙ্গনা তুলশী বেতসপত্রের মত।

আছড়ে পড়লো ঠাকুর হরিদাসের পায়ের উপর।

চোখের জলে ধুয়ে গেলো ঠাকুরের দুইপা।

কেঁদে কেঁদে বোললে ঠাকুর আমাকে ক্ষমা করো রামচন্দ্রের কুমন্ত্রনাই আমাকে এ পথে টেনে এনেছে। আমি যে বারাঙ্গনা। আমার পাপের কি সীমা আছে আমাকে তুমি কৃপা কোরে চরণে আশ্রয় দাও।

হরিদাস বোললেন ঃ—আমি সব জানি। রামচন্দ্র খানের স্বভাব আমার অজ্ঞাত নয়। আমি সেই দিনই চলে যেতাম—শুধু তোমাকে রক্ষা করার জন্যই তিনদিন রয়ে গেলাম।

একটু থেমে বোললেন ঃ—উঠ তোমার আবার পাপ কোথায় একবার হরি নামে সকল পাপ মুছে যায়। তুমি তো সেই নাম গ্রহণ কোরেছো, আর তোমার তো পাপ নেই।

তুলশীর কান্না থামে না।

চোখের জল মুছে বোললে ঃ—ঠাকুর! বোলে দাও আমি কি করব। আমার এ ভবযন্ত্রণা থেকে মুক্তির পথ দেখাও।

—তোমার ধন সম্পত্তি যা আছে সব দীন দুঃখীদের বিলিয়ে

দাও। সব বিলিয়ে দিয়ে তুমি এখানে এই কুটিরে এসে ভগবানের নাম করো। তাহালেই তুমি কৃষ্ণের চরণ পাবে।

তুলশী আনন্দে আত্মহারা হোয়ে বোললেন ঃ—আমি কৃষ্ণের চরণ পাবো।

আহা সেদিন আমার কবে হবে।

—তোমার কাজ তুমি করো তাঁর কাজ তিনি কোরবেন। তিনি তো সবাইর ঠাকুর। অন্ধের, আতুরের, ইতরের, মহতের। সকলেরই ঠাকুর। যে তাঁকে যে ভাবে ডাকবে তিনিও তাকে সেইভাবে দেখা দেবেন। তিনি তো সব সময় জীবের দ্বারে দ্বারে প্রেম ভিক্ষা কোরে বেড়াচ্ছেন। তাঁর নাম করে, তাঁর ধ্যান করো—নিশ্চয়ই তিনি দেখা দেবেন।

কৃষ্ণ কর পদতল কোটি চন্দ্র সুশীতল
তাব স্পর্শ যেন স্পর্শমনি।
তাব স্পর্শ নাহি যার সে যাউক ছারখার
সেই বহু লৌহসম গনি॥

ঠাকুর হরিদাস আর কিছু না বোলে সেই ঘর থেকে বের হোলেন।

বারাঙ্গনা তুলশী হোল কৃষ্ণপ্রিয়া।

নামের এমনই মহিমা যে বারাঙ্গনাও ঈশ্বরকৃপালাভে ধন্য হয়।

তুলশী সেই কুটিরেই রয়ে গেলেন।

তাঁর যা কিছু ছিল সব তিনি বিলিয়ে দিয়ে মাথা মুড়িয়ে ফেলে অতি সাধারণ ভাবে জীবন কাটাতে লাগলেন।

তুলশী তিনলক্ষ নাম গ্রহণ করেন।

সারাদিন কয়েকটা তুলশীর পাতা চিবিয়ে কাটান।

আবার ক্ষুধা তৃষ্ণা তাঁর কোথায়? নামামৃত সুধা যার কণ্ঠে তাঁর ক্ষুধা তো আর থাকেনা।

তুলশী হোলেন পরমবৈষ্ণবী।

বারাঙ্গনার চরিত্র দেখে সবাই ধন্য ধন্য কোরতে থাকে। ঠাকুর হরিদাসের কথা সবার মুখে—এমন মহাপুরুষকে মানুষ চিনতে পারলো না। তাঁকে অপমান কোরতে গিয়ে নিজেরাই অপমানিত হোল।

রামচন্দ্র খান নিজের পাপেই নিজে জড়িয়ে পড়লেন।

যে অপরাধের বীজ তিনি নিজে পুঁতেছিলেন—সেই বৃক্ষের ফল তিনি নিজেই ভোগ কোরলেন।

অবৈষ্ণব রামচন্দ্র খান এত বৈষ্ণবদ্বেষী হোলেন যে প্রভু নিত্যানন্দ তার দুর্গামণ্ডপে এসে উঠলে রামচন্দ্র বোলেছিলেন যে এত লোকের স্থান এখানে হবে না। তিনি তার চেয়ে বরং কোন গোয়ালার গোয়ালে যান। প্রভু নিত্যানন্দ সে স্থান ত্যাগ কোরলে রামচন্দ্র খান রাগে নিত্যানন্দ যেখানে বসেছিলেন সেখানকার মাটি কেটে ফেলে গোবর লেপে দিয়েছিলেন।

রামচন্দ্র খন নবাবকে কর দিতেন না।

ম্লেচ্ছ উজির দলবল নিয়ে তার বাড়ী এসে উঠে নিষিদ্ধ মাংস রান্না কোরে খেয়ে রামচন্দ্র ও তার স্ত্রী পুত্রকে বেঁধে নিয়ে গ্রাম লুঠ কোরে চলে গিয়েছিল। একের পাপে আর দশজন নষ্ট হয়।

মহান্তের অপমান যে গ্রামে দেশে হয়।
একজনের দোষে সব দেশ হয় ক্ষয়॥

পাষণ্ড রামচন্দ্র খান জীবন ভোর যে পাপ কোরেছেন তার শাস্তি তিনি ভোগ কোরেছেন।

ভগবানকে যিনি আশ্রয় করেন তাঁর নামে গানে যিনি বিভোর

থাকেন তার গায়ে কাঁটার আঁচড় লাগবে কি কোরে ? তিনিই তো তাকে কোলে করে বসে আছেন। সংসারী জীবের মত নিরাশ্রয় আর কেউ নয় এ জগতে। বন্য জীব জন্তুরও আশ্রয় আছে। মানুষের কোন আশ্রয় নেই। এমন অসহায় আর কে আছে ? জীবের ভুলে জীবের দুঃখকষ্ট শোক-তাপ। শ্রষ্টার সন্ধান তো কেউ করে না। যাঁর কৃপায় তুমি মাটি পেলে। বাপ মা পেলে স্ত্রী পুত্র পেলে। তাঁর কথা কি মনে আছে ? এই জীবের দুঃখের কারণ—যাঁকে স্মরণ কোরলে এ ভব সাগর অনায়াশে পার হওয়া যায়। যাঁর নামে ভবযন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়া যায় তাঁর কথা ভাবিনা বোলেই তো দুঃখকষ্টের দাবানলে দেহ জ্বলছে। আর কবে মনে পড়বে তাঁর কথা ? তিনি যে কান পেতে আছেন তোমার ডাক শোনবার জন্য। তোমার জীবন বৃক্ষ তো পুত্র-কন্যা, আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধবের শেকড়ে দেহজমি কামড়ে পড়ে আছে চারিদিক থেকে। এ শেকড় কেটে কবে সেই করুণাময়ের সন্ধানে বের হবে।

লগ্ন যে বয়ে যায়।

আর দেরী কেন ?

ঠাকুর হরিদাস বেনাপোল থেকে চলে এলেন হুগলীর কাছে চান্দপুর গ্রামে। চান্দপুর গ্রাম আদিশপ্তগ্রামের কাছাকাছি।

তিনি এসে বলরাম আচার্য্যের বাড়ীতে উঠলেন। হিরন্য আর গোবর্দ্ধন দুই মুলুকের অধিকারী। বলরাম আচার্য, এদের পুরোহিত। হরিদাসকে ভক্তিশ্রদ্ধা করেন তিনি। নির্জ্জন কুটিরে হরিদাস নাম কীর্ত্তন করেন।

বলরাম নিজেকে বড় ধন্য মনে করেন। এমন মহাপুরুষের পাদস্পর্শে চান্দপুর গ্রামও যেন ধন্য হয়।

বালক রঘুনাথ দাস ঠাকুর হরিদাসের কাছে কৃষ্ণপ্রেমের পাঠ নেয়। হরিদাস তার ওপর সদয় হন। দেখতে দেখতে বালক রঘুনাথ চৈতন্য লাভ করে।

ঠাকুর হরিদাস যাকে কৃপা করেন কৃষ্ণ কৃপাও তার ওপর বর্ষিত হয়।

একদিন বলরাম অনুনয় কোরে হিরন্য ও গোবর্দ্ধনের সভায় নিয়ে এলেন।

ঠাকুরকে দেখে দুইভাই প্রণাম কোরলেন।

দুইভাই সবাই ঠাকুরের প্রশংশায় পঞ্চমুখ। দিনেরাতে তিন লক্ষ্য জপ যিনি করেন তিনি যে নামীর সন্ধান জানেন একথা নিশ্চিত।

সভাস্থ পণ্ডিতেরা নামের মহিমা বর্ণনা করেন—

কেউ বলেন—নামেও পাপক্ষয় হয়।

কেউ বলেন—নামেতে জীবের মোক্ষলাভ হয়।

হরিদাস বলেন—নামের শুধু এই দুই গুণ নয়। নামেতে কৃষ্ণপদে মতি হয়। নামেতে দেহে মনে কৃষ্ণপ্রেম জন্মে। নামেতে নামীরও দরশন হয়। পরশন হয়। কলিতে এই নামই মন্ত্র, এই নামই তন্ত্র, এই নামই শাস্ত্র। এই নাম ছাড়া কলির·জীবের আর কোন আশ্রয় নেই। আরও আছে নামের মহিমা। আপনারা ব্যাখ্যা করুন।

সবাই বলেন—যেখানে ঠাকুর রয়েছেন সেখানে আমরা কি কোরে ব্যাখ্যা করি। আপনিই বলুন শ্রীমুখে আমরা শুনে ধন্য হই।

হরিদাস বলেনঃ—সূর্য উঠলে যেমন চোর ডাকাত রাক্ষস ভয়ে পালায় তেমনি নামের উদয় হোলে পাপ তাপের ক্ষয় হয়।

নামের গুনে পাপ আর থাকতে পারে না। নামের উদয়ে কৃষ্ণ পদে প্রেমোদয় কৃষ্ণ ভক্তিই জীবের ভবযন্ত্রণার মুক্তি।

হরিদাস ঠাকুর আর কিছু না বোলে মনে মনে নাম জপ করেন।

গোপাল চক্রবর্ত্তী খাজনা আদায় করেন। তিনি সুদর্শন যুবক নিজেকে আবার পণ্ডিত মনে করেন। নামেতে মুক্তি হয় একথা তিনি গ্রহণ কোরতে রাজী নয়।

তিনি একটু রাগের বশেই বোললেন—এ মুক্তি আমি মানিনা কোটিজন্মে ব্রহ্মজ্ঞানে যে মুক্তি মেলেনা একবার নামেতেই সেই মুক্তি কি কোরো মিলবে।

"হরিদাস কহে কেনে করহ সংশয়।
শাস্ত্রে কহে নামাভাগমাত্র মুক্তি হয়॥
ভক্তিসুখ আগে মুক্তি অতি তুচ্ছ হয়।
অতএব ভক্তগণে মুক্তি না হয় ইচ্ছয়॥

সভাস্থলে দুইজনে প্রবল কথা কাটাকাটি চলে।

বলরাম আচার্য গোপাল চক্রবর্তীকে বকাবকি করেন। ঠাকুরকে যে অপমান কোরতে পারে সে না পারে এমন কাজ নেই। সভার সকলে দুঃখিত হয়।

হিরন্য, গোবর্দ্ধন, গোপাল চক্রবর্তীকে শাশায়।

বলরাম বললেন তাকেঃ—তুই ঠাকুরকে অপমান করিস কোন সাহসে।

ব্রাহ্মণ হোলেই কি সে ভক্তির মর্ম জানে? না জেনে কিছুই একেবারে সর্ব্বজ্ঞ বনে গেছিস। তোর সর্বনাশ হবে।

সাধক তুলশীদাস একজায়গায় বোলেছেন—

ব্রাহ্মণ ভয়া তো কা ভয়া পথে লপটে সূত।
ধ্যান ধরম কা মরম না জানে যেইছে জংলী ভুত॥"

হরিদাস সভাস্থল ত্যাগ কোরে উঠে গেলেন।

সকলে তাঁর পদতলে পড়ে ক্ষমা ভিক্ষা করেন।

হরিদাস নির্ব্বিকার। তাঁর রাগ কোথায়! কোথায় তাঁর ক্রোধ অভিমান?

এসব তাঁকে বর্জ্জন কোরেছে বহুকাল—তিনলক্ষ নামের মাঝে এদের ঠাঁই কোথায়?

হরিদাস মিষ্টি হেসে বোললেন ঃ—তোমাদের তো কোন দোষ নেই। এই তার্কিক বিপ্র অজ্ঞ। তর্ক দিয়ে কি নামের মহিমা বোঝা যায়! সে এসব তত্ত্ব জানবে কি ভাবে? তোমাদের সবাইকে কৃষ্ণ কুশলে রাখুন। আমার এতটুকু দুঃখ নেই মনে! ভক্তের অপমান, ভক্তের নিন্দা ভগবানের সহ্য হয় না কোনদিনই। ভগবান সবই সইতে পারেন। পারেন না শুধু ভক্ত নিন্দা সইতে।

গোপাল চক্রবর্ত্তীর তিনদিনের মধ্যে কুষ্ঠরোগ দেখা দিল। নাক বড় হোল, হাতের আঙুল বড় হোয়ে গলতে সুরু করলো।

এই ঘটনায় সবই চমৎকৃত হোল। বুঝতে পারলো ভক্তের অপমান ভগবানের গায়ে লেগেছে তাই ঐ বিপ্রকে এই শাস্তি বহন কোরতে হোল।

"ভক্তের স্বভাব অজ্ঞের দোষ ক্ষমা করে।
কৃষ্ণের স্বভাব ভক্তনিন্দা সহিতে না পারে॥"

ঠাকুর হরিদাস বিপ্রের কষ্টের কথা শুনে বড় ব্যথা পেলেন। শ্রীহরির কাছে তার মঙ্গল কামনা করেন তিনি।

বলরাম আচার্য্য বুঝতে পারেন ঠাকুর বড় চঞ্চল হোয়েছেন। আর ঠাকুরকে এ গ্রামে রাখা যাবে না।

তিনি বোললেন ঃ—প্রভু আমার মন বোলেছে আপনি সত্বর গ্রাম ছেড়ে চলে যাবেন।

—হ্যাঁ বলরাম ঠিকই বোলেছো, কৃষ্ণের ইচ্ছা নয় আমি আর এখানে থাকি। তাঁর ইচ্ছাতেই তো সব হয়। তাই আমি চলে যাবো। মন আমার বড় ব্যাকুল হোয়েছে।

হরিদাস ঠাকুর শান্তিপুর এলেন।

এই ব্যাকুলতাই তো কৃষ্ণপ্রেম। এই আকুলতাই তো কৃষ্ণ সন্দর্শনে টেনে নিয়ে যায়।

শান্তিপুরে আর এক মহাজ্ঞান তপস্বী অদ্বৈতাচার্য্য তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন সসম্মানে। কৃষ্ণগুণে যিনি গুণী তাঁর আদর সর্ব্বত্র। জড়িয়ে ধরলেন অদ্বৈতাচার্য্য ঠাকুর হরিদাসকে।

অদ্বৈতাচার্য্য গঙ্গারধারে নির্জ্জন স্থানে একটা ছোট ঘর তৈরী কোরে দিলেন। আচার্য্যের গৃহে তিনি সেবা করেন আর দুইজনে কৃষ্ণকথায় সময় কাটান।

হরিদাস একদিন অদ্বৈতাচার্য্যকে বোললেন ঃ—আমার এক নিবেদন আছে।

অদ্বৈতাচার্য্য জোড়হাতে বলেন ঃ—বলুন।

—আমাকে নিত্য আপনি অন্ন ভোজন করান কি প্রয়োজনে? মহা মহা কুলীন ব্রাহ্মণের বাস এখানে। আমার মত নীচকে আদর যত্ন কোরতে আপনার ভয় করে না। এমন আচরণ কৃপা কোরে আমার সঙ্গে কোরবেন যাতে আপনার কোন বিপদ না হয়।

অদ্বৈতাচার্য্য তাঁর কথা শুনে বোললেন ঃ— আপনি খেলে আমার যে কোটি ব্রাহ্মণ ভোজন করানো হয়। আমি ভাবছি অন্যকথা।

—কি আচার্য্য?

জীবজগতের চিন্তা আমাকে বড় ব্যথিত কোরেছে। চারিদিকে

অবৈষ্ণবাচারণ। ধর্ম্মের গ্লানিতে দেশ ছেয়ে গেলো। অধর্ম্মের পূজা চলছে ঘরে ঘরে—যুগে যুগে ভগবান অবতীর্ণ হন যখনই ধর্ম্মের গ্লানি হয়। দেশে যখন অন্যায় অবিচার আর অত্যাচারের স্রোত বয়ে যায় তখনই তো তিনি আসেন। তাঁর কি আসার সময় এখনও হয়নি! তাঁর আগমন যাতে সত্বর হয় সেই ব্যবস্থাই আমাদের কোরতে হবে।

হরিদাস ঠাকুরও বোললেন ঃ—আমিও সেই চিন্তায় ব্যাকুল হোয়েছি।

অদ্বৈতাচার্য্য পূজার্চ্চনা সুরু করেন।

হরিদাস তাঁর গৃহে বসে নামকীর্ত্তনে মাতেন।

কলির দুই ভগীরথ অদ্বৈতাচার্য্য আর ঠাকুর হরিদাস ভগবানকে আনয়ন কোরবার জন্য সাধনায় মগ্ন হোলেন।

হে পরম করুণাময়! তুমি করুণাধারায় নেমে এসো। তুমি না এলে জীব উদ্ধার হবে না। তোমার আসার আশায় আমরা দিন গুনছি। অধর্ম্মের উত্থানে দেশ ডুবে গেলো পাপের দরিয়ায়। জীব আজ বিপথগামী। তাদের দুঃখকষ্টের সীমা নেই। পাপে, শোকে, তাপে সমস্ত জগৎ আচ্ছন্ন। তোমার সৃষ্টি আজ বিপন্ন। হে জীবপালক, প্রেমের ঠাকুর, তোমার ভুবন-ভোলানো মনোহর মূর্ত্তি নিয়ে দেখা দাও। দেশ আবার তোমার গানে মেতে উঠুক।

ঠাকুর হরিদাস তাঁর ক্ষুদ্র গৃহে বসে চোখের জলে বুক ভাসাচ্ছেন। জপের মালা তাঁর অবিরাম ঘুরে চলেছে।

তিনি কাঁদছেন আর বোলছেন—

"কলিকালে ধর্ম্ম কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন।
কৃষ্ণ শক্তি বিনা নহে তার প্রবর্ত্তন॥"

তোমার নামে জগত মাতবে। তোমার গানে ভুবন প্রকম্পিত হবে। তেমার ভাবে জীব পাগল হবে। তোমাময় জগত হবে। তোমাময় হওয়ার জন্যই তো ঘরে ঘরে চলছে তোমার পূজা আরাধনা। তুমি জীবের জীবন। পশুপক্ষী তোমার জন্য কাঁদছে। বৃক্ষলতা তোমার আশে পথ চেয়ে আছে। আকাশের মেঘ তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে মেঘলোকে। পথঘাট বনপ্রান্তর তোমার পদস্পর্শে ধন্য হবে বোলে দিন গুনছে।

এবার এসো তুমি! ধরণী শীতল করো তোমার চরণ স্পর্শে।

একদিন সন্ধ্যায় হরিদাস নাম কোরছেন।

জোছনা ছড়ানো রাত। আকাশের চাঁদে যেন রূপের সমারোহ।

গঙ্গার জলে চাঁদের আলো পড়ে চিক্‌চিক্ কোরছে। ঢেউ-গুলো এসে যেন আছড়ে পড়ছে। এক একবার এসে তারাও যেন নাম শুনে চলে যাচ্ছে। আকাশের এক কোণে ঐ যে নক্ষত্ররাজি তারাও যেন এক জায়গায় জড়ো হোয়ে বসে শুনছে ঐ মধুর নাম। এমন সময় একজন অপরূপ সুন্দরী নারী এসে তুলসী মণ্ডপের চারিদিকে ঘুরে বেড়িয়ে হরিদাসের চরণ বন্দনা কোরল।

হরিদাস তাকালেন।

কি অপরূপ রূপ তার! যেন আকাশ থেকে চাঁদ এসেছে নেমে।

সেই নারী অপরূপ হাস্যে বোললেন ঃ—ওগো, ঠাকুর সারা জগতে পূজ্য তুমি, তোমার রূপগুণের তুলনা নেই। তোমার সঙ্গে সুখ উপভোগ কোরব বোলে আমি এসেছি। আমাকে

তুমি কৃপা করো। দীন জনে দয়াই তো তোমার স্বভাব। আমাকেও একটু দয়া করো।

হরিদাস বোললেন ঃ—রাত্রি দিনে তিনলক্ষ নাম করাই আমার ব্রত। এ ব্রত শেষ না হোলে তো তোমার কথা আমি রাখতে পারি না। তোমার অধৈর্য্য হোলে তো চলবে না। তুমি দ্বারে বসে নাম শোন তারপর তোমার ইচ্ছা আমি পূরণ কোরব।

এই ভাবে তিনদিন কেটে যায়।

ঐ নারী নিত্য আসেন আর রাত্রি শেষে চলে যান।

প্রতিদিন ঐ নারী হরিদাসকে ভোলাবার জন্য নানা পথ ধরেন কিন্তু হরিদাস টলেন না।

তিনদিন কেটে গেলে ঐ নারী বলেন ঃ—তিনদিন এলাম তাও তোমার সময় হোল না আমার দিকে ফিরে তাকাবার। আমি এতই হীন!

হরিদাস ব্যস্ত ভাবে বোললেন ঃ—না, না, আমার অপরাধ নিও না। তুমি হীন নয়। তোমার মাঝেই তো আমার প্রকাশ। তোমার মাঝেই যে বিরাজ কোরছে বৃন্দাবনের লীলা। আমি কি কোরব। যে নিয়ম কোরেছি তা আমি ছাড়ি কি কোরে!

তখন ঐ নারী তাঁকে নমস্কার কোরে বলেন ঃ—ঠাকুর হরিদাস, আমি মায়া, তোমাকে পরীক্ষা কোরতেই এতদূর এসেছি। তুমি ধন্য, ধন্য তোমার নাম গান, ধন্য জগত। যত দেব-দেবতা এমনকি ব্রহ্মাকেও আমি মোহিত করেছি। শুধু তোমার কাছেই আমি হার মানলাম। তুমি মহাভাগবত, তোমার দর্শনেও পূণ্য হয়। তোমার সংকীর্ত্তন শুনলে পাপক্ষয় হয়। হরিদাস, আমার কৃষ্ণ নাম নেওয়ার জন্য মন বড় ব্যাকুল হোয়েছে। তুমি আমাকে কৃষ্ণনাম দাও।

এই কথা বোলে তিনি হরিদাসের পদধূলি নিয়ে বোললেন—আমাকে কৃষ্ণনাম দাও। আমাকে কৃষ্ণপ্রেমের পথ বোলে দাও।

হরিদাস বোললেন ঃ—নাম সংকীর্ত্তন করো। কৃষ্ণকে পাবার এই একমাত্র পথ। যত নাম কোরবে তত তাঁর কাছে যাবে। এই নামই তোমাকে কৃষ্ণপদে টেনে নিয়ে যাবে। শুধু নাম—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ সব এই নামে।

শান্তিপুর থেকে হরিদাস এলেন ফুলিয়ায়।

তাঁব নাম এখন চরিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে—এমন হরিভক্ত এমন ধর্ম্মনিষ্ঠ, সদজন মেলা ভার। ফুলিয়ার গ্রামবাসী, সকল জাতি, আবালবৃদ্ধ বনিতা তাঁকে আপন জনের মত টেনে নিল। হরিদাস যে মুসলমান একথা তাঁকে দেখলে কে বোলবে! গলায় তুলসীর মালা। সারা অঙ্গে তিলক লেপন। হাতে হরিনামের ঝুলি। সবার ওপর শান্ত-সৌম্য-কান্তি, মনে হয় কোন স্বর্গের দেবতা নেমে এসেছে মর্ত্ত্যের মাটিতে।

তিনি প্রতিদিন নাম বিলান ফুলিয়ার পথে ঘাটে। গ্রামের ছেলেরা তাঁর পিছু নেয় তারাও তাঁর সাথে নাম কোরতে কোরতে পেছন পেছন ছোটে। কি অপূর্ব্ব দৃশ্য! নামের বন্যায় ভেঙে যায় ফুলিয়া। ভিক্ষেয় তিনি যা পান ফল বাতাসা সব বিলিয়ে দেন ঐ সব ছেলেদের মধ্যে। তারা আনন্দে নৃত্য করে আর খায় ঐ ফল বাতাসা।

হরিদাস দিন শেষে ফিরে আসেন গঙ্গার তীরে গোফায়। ঐখানেই উনি থাকেন আর নাম গান করেন। নিত্য সকালে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা এসে ভীড় করে। কেউ এসে তাঁর পায়ের ধুলো নেয়। কেউ এসে গোফায় গড়াগড়ি যায়। কেউ এসে থলি থেকে মালাটা নিয়ে জপতে বসে যায়। হরিদাস

মহা সুখী—তিনি শুধু বলেন ঃ—ওরে তোরা কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল। তোদের মিষ্টি মুখের ঐ ডাক বড় ভালো লাগে।

হরিদাস দেখেন গোফার এক পাশে ছোট একটা ছেলে চোখ বুজে মালা ঘোরাচ্ছে মনে পড়ে যায় তার ভক্ত প্রহ্লাদের কথা, ধ্রুবর কথা। তারাও তো এতটুকু বয়সেই কৃষ্ণকে পেয়েছিল।

হরিদাস ছেলেটাকে কোলে কোরে নৃত্য করেন আর কাঁদেন ঃ—ওরে তোরা বলে দে কেমন কোরে আমি তাঁকে পাবো।

বার বার ছেলেটাকে দাঁড় করিয়ে তার পায়ের ধুলো সারা গায়ে মাথায় মাখেন। কৃষ্ণময় জগত যাঁর তাঁর কাছে সবাই কৃষ্ণ। কৃষ্ণ ছাড়া আর কিছুই তো তিনি দেখতে পান না।

এমনি কোরে নাম কীর্ত্তনে ডুবে যায় ফুলিয়া। পথ ঘাটে ছড়িয়ে যায় নামের রেণু।

হরিদাস যে গোফায় থাকতেন্ তার নীচেয় থাকতো এক মহা নাগ। গ্রামবাসীরা অনেকে তাকে দেখেছে। গ্রামের কেউ কেউ চিন্তিত হোয়ে পড়লেন। তারা একদিন এসে হরিদাসকে বোললেন এ স্থান ত্যাগ কোরে অন্যত্র চলে যেতে।

হরিদাস বোললেন হেসে ঃ—আপনারা চিন্তা কোরবেন না। কৃষ্ণনাম ওর কানে গেছে যখন, তখন আর ওর হিংসা নেই।

মহানাগ বৈসে এক গোফার ভিতরে।
তাহার জ্বালায় কেহ রহিতে না পারে ॥

হরিদাস সবাইকে আশ্বস্ত করেন ঃ—সাপ যদি কালকের ভিতরে না চলে যায় তাহলে আমি এ স্থান ত্যাগ কোরব। আপনাদের কোন ভয় নেই, আপনারা প্রেমানন্দে নাম গান করুন।

হরিদাসের এই কথা শুনে সবাই আশ্বস্ত হোলেন।

তারপরদিন সবাই অবাক হোয়ে দেখলো যে সাপটা বের হোয়ে গোফা ছেড়ে যাচ্ছে।

ঠাকুর হরিদাস তার জন্য এ স্থান ত্যাগ কোরবেন এ কথা সাপের সহ্য হোলনা তাই সে নিজেই ছেড়ে গেলো।

গোফার ওপরে একটা কূপ আজও আছে—এই কূপের ওপরে বসে তিনি সাধন ভজন কোরতেন। এখানকার প্রকৃতি শান্ত। নীরব নিস্তব্ধ চারিদিক। সারা প্রকৃতিও যেন বসেছে হরিদাসের মত এক মহাসাধনায়। আশপাশে ছড়িয়ে আছে বাঁশঝাড়। বাঁশপাতার শনশনানীতেও মনে হয় হরিনামের স্বর। নিত্য সন্ধ্যায় ঘরে ঘরে প্রদীপ জ্বলে।

ঠাকুর হরিদাসের আশ্রমে তখন কীর্ত্তন জমে ওঠে। গ্রামের কীর্ত্তনীয়ারা আসে খোল করতাল নিয়ে। নাম গানে মেতে ওঠে হরিদাসের অংগন। গংগার জলে কুলুকুলু স্বর।

মনে হয় ঐ জলেব মাঝে দোয়াকির স্বর।

হরিদাস তবুও মাঝে মাঝে ভাবেন এ নামের বন্যায় সবাই ভাসছেন। সবার ঘরে ঘরে এ নাম এখন পৌঁছায়নি। এই ভেবে কীর্ত্তন সেরে তিনি উচ্চৈঃস্বরে নাম গান করেন। রাত্রির নিস্তব্ধতায় এ নাম প্রতিধ্বনি কোরে ঘুরে বেড়ায় আকাশে-বাতাসে।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

হরিদাস চীৎকার কোরে বলেনঃ—গাও সবাই উচ্চৈঃস্বরে। মনে মনে এ নাম কোরলে নিজের জন্যই করা হবে। উচ্চৈঃস্বরে নাম গান করার জন্য সবার কানে পৌঁছে দাও এই নাম। সকলের ডাক তাঁর কানে পৌঁছলে আপনিই তিনি নেমে আসবেন।

ডাকো ডাকো প্রাণ ভরে ডাকো। তিনি আসবেন। আমি যে তাঁর পায়ের নূপুরধ্বনি শুনতে পাচ্ছি। হে কৃষ্ণ! হে গোলক-বিহারী নারায়ণ, তুমি এসো—আমরা শুদ্ধ হোয়েছি, পবিত্র হোয়েছি, মনে মনে প্রাণে প্রাণে আমাদের সাড়া জেগেছে। আমরা সবাই তোমাতে মিশেছি। আমাদের এ দেহ মন প্রাণ সবই তোমাকে সমর্পণ করলাম। তুমি এসো—তোমার অদর্শন আমাদের পাগল কোরে তুলেছে।

ঠাকুর হরিদাস বালকের মত কাঁদছেন।

এমন কোরে কাঁদতে যদি সবাই পারতো!

চোখের জলে জগত না ভাসলে তো তিনি আসবেন না। চোখের জলে আশ্রয় নেবে প্রেম ভক্তি। চোখের জলে ভাসবে অপেক্ষা, তীতিক্ষা। তবেই বুঝি তুমি আসবে!

ওগো কৃপাকঠোর বংশীধারী, তোমার বাঁশীর সুর কানে দাও। এ বিরহ আর তো সইতে পারিনা।

তোমার প্রেমে ভাসিয়ে দাও, ডুবিয়ে দাও।

ফুলিয়া শান্তিপুর এলাকা তখন কাজীর দ্বারা শাসিত হোত।

হরিদাসেরই সম্বন্ধে তার কানে এ সংবাদ গেলো।

কাজী ক্রুদ্ধ হোলেন—মুসলমান হোয়ে হিন্দুর মত আচরণ। পবিত্র ইসলাম ধর্ম্ম তার কাছে কিছুই নয়। বিধর্ম্মীর ধর্ম্ম পালন এ কোন্ রীতি? হিন্দুদের সংগে মেলামেশা, তাদের সংগে কীর্ত্তন করা। এসব তার সহে না।

মুসলমান হোয়ে যে নিজ ধর্ম্ম ত্যাগ করে অন্য ধর্ম্ম গ্রহণ করে তাকে সাজা পেতেই হবে।

তিনি হরিদাসের বিরুদ্ধে নালিশ জানালেন তখনকার দেশ-প্রধান মুলুকপতির কাছে। আরও জানালেন হরিদাসকে কঠোর

সাজা না দিলে এ দেশের মুসলমান সব হিন্দু হোয়ে যাবে। এমন শাস্তি দিতে হবে যাতে আর সবাই দেখে জীবনে কোনদিন ধর্ম্ম-ত্যাগের কথা ভাববে না।

মুলুকপতি তাঁকে কারাগারে আবদ্ধ কোরে রাখতে আদেশ দিলেন। শ্রীকৃষ্ণ আশ্রয় যাঁর আশ্রয় তাঁকে কারাগারে রেখে কি কোরবে! ফুলিয়ার আবালবৃদ্ধবনিতা এর প্রতিবাদ কোরে উঠলো সমবেত ভাবে। কিন্তু কে কার কথা শোনে। তিনি হাসতে হাসতে কারাগারে গেলেন। মুখে তাঁর কৃষ্ণ নাম।

কারাগারে হরিদাসের দিন কাটে।

সারাদিনরাত নাম গান কোরে তাঁর দিন কাটে। বেশ ভালই হোল এখানে এসে। এমন নিরিবিলিতে নাম কোরে ভারী আনন্দ। কেউ আসে না, কাউকে এখানে দেখতে পাওয়া যায় না—শুধু বসে বসে নাম আর নাম। এমন সুযোগ পেয়ে হরিদাস খুশীই হলেন।

কারাগারে বসে তিনি দিনরাত নাম করেন।

পাহারাদাররা বিরক্ত হয়। তারা ঘুমুতে পারে না।

এক বৃদ্ধ পাইক হরিদাসকে পাহারা দেয়। হরিদাস যখন নাম করেন বুড়ো পাইক গরাদের শিক ধরে দাঁড়িয়ে থাকে।

হরিদাস মাঝে মাঝে বলেন ঃ—কি ভাই, কি শুনছো ?

—গান, বেশ ভাল লাগে তোমার গান।

হরিদাস বলেন ঃ—তোমার রাগ হয় না, আমি সারাদিন গান গাই।

বৃদ্ধ বোলে ওঠে ঃ—এর আগে কত চোর ডাকাত কারাগারে এসেছে, কিন্তু তোমার মত একজনও কেউ আসেনি।

একটু থেমে বলে ঃ—আচ্ছা, তুমি কি চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়লে ?

হরিদাস হেসে জবাব দেন ঃ—কৃষ্ণপ্রেমের চোর আমি, দিনরাত ভক্তির সিঁধকাঠি নিয়ে ঘুরে বেড়াই সেই কৃষ্ণপ্রেমের সন্ধানে· কিন্তু এমন ভাগ্য আমার এখনও তা আমি পেলাম না। তুমি আমায় আশীর্ব্বাদ করো তাড়াতাড়ি যেন আমার কৃষ্ণপ্রেম লাভ হয়।

—তার বুঝি অনেক দাম—

—দাম দিয়ে তা কি কেনা যায় ? সে জিনিষ পেতে হলে অনেক জনম কেটে যায়।

বৃদ্ধ অবাক হোয়ে তাঁর কথা শোনে।

হরিদাস আবার আপন মনে নাম করেন।

বৃদ্ধ বার বার ঘুরে ঘুরে তাঁর দরজায় আসে।

আর গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে থেকে একদৃষ্টে তাঁর দিকে চেয়ে থাকে। কতদিন কত সময় কেটে যায় তা বৃদ্ধের খেয়াল থাকে না।

হরিদাস বলেন ঃ—তুমি খুব ভাল মানুষ, এ জন্মে তুমি এই কাজ কোরছ কিন্তু আসছে জনমে তুমি এর চেয়ে ভাল কাজ পাবে।

কি কোরে বুঝলে ?

হরিদাস ঠাকুর হাসেন আর বলেন ঃ—হে কৃষ্ণ, কি তোমার অপরূপ লীলা। কাউকে তুমি কারাগারে রেখেছো আবার কাউকে রেখেছো তাকে পাহারা দিতে। জগতের জীব আজ যে এমনি ধারা আবদ্ধ রয়েছে সংসার কারাগারে। তাদের মুক্তির ব্যবস্থা করো।

বৃদ্ধ এবার একটু কাছে এসে বলে ঃ—রাতে তুমি বাতি জ্বেলে কি করো ? খবরদার, বড় পাইকদার যদি দেখতে পায় তাহলে তোমাকে শেষ কোরে দেবে।

অবাক হোয়ে যান হরিদাস ঃ—সে কি গো, বাতি কোথায় পাবো ? সারারাত তো অন্ধকারেই থাকি।

—গতকালও দেখেছি তোমার ঘরে আলো।

—কেমন আলো বল তো ?

—দেখলাম তোমার সমস্ত ঘর আলোয় আলোয় ভরে গিয়েছে মনে হোচ্ছে আসমানের চাঁদ বুঝি তোমার কাছে নেমে এসেছিল।

হরিদাস কাঁদছেন।

অঝোর ধারায় কাঁদছেন।

—হ্যাঁগো, কাঁদছো কেন গো ?

—কাঁদবো না, তোমার মত ভাগ্যবান কে আছে! তুমি ঠিকই দেখেছো। বৃদ্ধ বোকার মত তাঁর দিকে চায়।

পরে বলে ঃ—ভাই একটা কথা বার বার আমার মনে আসে।

—কি ভাই ?

বৃদ্ধ বলে ঃ—আমার মনে হয় তুমি একজন পয়গম্বর। তুমি আসার পর আমার দিন খুব ভাল যাচ্ছে। জানো বড় ছেলেটার একটা গোলামী জুটেছে কাজীর দরবারে। মেয়েটার একটা ফুটফুটে ছেলে হোয়েছে। ছোট মেয়েটার এক কথায় সাদী ঠিক হোয়ে গেলো। তুমি পীর, তুমি পয়গম্বর। আমার হাজার সেলাম নাও।

—ও কথা বোলে আমাকে ভাই লজ্জা দিও না। পীর-পয়গম্বর হোতে গেলে যে গুণ চাই সে গুণ তো আমার নেই। আমার মনিব কৃষ্ণ আমি তার দাস।

বৃদ্ধ বলে ঃ—একটা কথা তোমাকে চুপিচুপি বলি শুনবে ?

—কি ভাই ?

বৃদ্ধ চারিদিক চেয়ে বলে ঃ—সারা জীবনে একটা পুণ্য কাজও আমি করিনি। সে সুযোগটা তুমি আমাকে দাওনা।

—কি বলো ?

—আমি তোমাকে ছেড়ে দিতে চাই। আজ রাতে চোরাপথ দিয়ে তোমাকে পথে তুলে দিয়ে আসবো।

হরিদাস হাত নেড়ে বলেন ঃ—এ যে বড় অধর্ম্ম। এখনও আমার বিচারের দিন ঠিক হয়নি। কাউকে না বোলে পালিয়ে গিয়ে আমি অপরাধী হবো।

একটু থেমে বলেন ঃ—তুমি কিছু চিন্তা কোরনা। কৃষ্ণের ইচ্ছায় তোমার ভাল হবে। কৃষ্ণ ইচ্ছায় আমি এখানে এসেছি, এবার কৃষ্ণ ইচ্ছায় এখান থেকে চলে যাবো।

বৃদ্ধ পাহারা দিতে থাকে।

হরিদাস কারাগারে বসে কৃষ্ণনাম করে।

কংসের কারাগারে কৃষ্ণের দিনরাত কেটেছে কতদিন, আজ আবার কৃষ্ণভক্ত হরিদাসও রয়েছেন কারাগারে।

মুলুকপতি হরিদাসের বিচারের দিন ঠিক কোরে দিলেন।

বিচারকক্ষ লোকে লোকারণ্য। ফুলিয়া থেকেও অনেক লোক গেছে তাদের প্রিয় হরিদাসের বিচার দেখতে। দেশের লোক আজ-যেন সব ভেঙে পড়েছে মুলুকপতির বিচারশালায়। হিন্দু-ধর্ম্ম পালন করেন মুসলমান হোয়ে, তাঁরই বিচার করবেন আজ মুলুকপতি। এ বড় মজার বিচার। মুলুকপতি কি বিচার করেন তাই দেখার জন্যই তো এত লোক সমাগম।

ঠাকুর হরিদাসকে হাজির করা হোল। মুলুকপতি উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে বসতে বোললেন।

মুলুকপতি বলেন—

"কেনে ভাই; বিরূপ তোমার দেখি মতি
কত ভাগ্যে দেখ তুমি হৈয়াছ যবন।
তবে কেন হিন্দুর আচারে দেহ মন॥
আমরা হিন্দুরে দেখি নাহি খাই ভাত।
তাহা তুমি ছাড় হই মহাবংশ জাত॥
জাতি ধর্ম্ম লঙ্ঘি কর অন্য ব্যবহার।
পরলোকে কেমতে বা পাইবা নিস্তার॥
না জানিয়া যা কিছু করিলে অনাচার।
সে পাপ ঘুচাহ করি কলমা উচ্চার॥"

হরিদাস হাতজোড় করে বলেন—

"শুন বাপ্! সবারই একই ঈশ্বর
নামমাত্র ভেদ করে হিন্দুয়ে যবনে।
পরমার্থে এক কহে পুরাণে কোরানে॥
একশুদ্ধ নিত্য বস্তু অখণ্ড অব্যয়।
পরিপূর্ণ হই বৈসে সভার হৃদয়॥"

কিছুক্ষণ চুপ কোরে থেকে হরিদাস আবার বোললেন ঃ— পরম করুণাময় ভগবানকে যে ভাবে যে ডাকুক বা ডাকতে পারে—তিনি শুধু হিন্দুর নয়, মুসলমানেরও নয়, তিনি সবার।

হরিদাসের কথায় মুলুকপতি বিস্মিত ও সন্তুষ্ট হোলেন। এমন জ্ঞানতাপসকে তিনি কি শাস্তি প্রদান কোরবেন ?

মুলুকপতির হাবভাব দেখে কাজী সন্তুষ্ট হোলেন না। ভাবলেন এই সব ভণ্ডামীতে ভুলে তিনি বোধহয় হরিদাসকে ছেড়ে দেবার নির্দ্দেশ দেবেন।

তিনি বোললেন ঃ—হুজুর আপনি ওর কথায় ভুলবেন না।

ওকে শাস্তি না দিলে অন্যসব মুসলমানরা বিগড়ে যাবে। মুসলমান ধর্ম্ম রক্ষার্থে ওর সাজা হওয়া একান্ত দরকার।

হরিদাস হাসতে থাকেন কাজীর কথায়।

কাজী রাগে গজরাতে থাকেন আর বার বার মুলুকপতির দিকে চান।

হরিদাস বলেন ঃ—এ জগতের শাসনকর্ত্তা মুলুকপতিও নয় আর ঐ কাজীও নয়। যিনি এই জীব সৃষ্টি কোরেছেন তিনিই দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা। যার যার কর্ম্মফল অনুযায়ী তিনিই শাস্তি দেবেন। আমাকে শাস্তি দেবে কে? কি এমন শাস্তি তোমার ঐ কাজীর ভাণ্ডারে আছে যার ফলে আমি হরিনাম ভুলতে পারি? যতই শাস্তি দাও হরিনাম আমি ছাড়তে পারবো না।

"খণ্ড খণ্ড হই দেহ যদি যায় প্রাণ
তবু বদনে না ছাড়ি হরিনাম।"

ঈশ্বরের যে সেবক সে দেহ ছাড়তে পারে তবুও তাঁকে ছাড়তে পারে না।

রামায়ণের তরণীসেনের কাটামুণ্ড রাম নাম উচ্চারণ কোরেছিল। এমন কোন শাস্তি নেই যা ভক্তের কণ্ঠ থেকে নাম ছিনিয়ে নিতে পারে।

মুলুকপতি হরিদাসের কথা শুনে এত সন্তুষ্ট হোলেন যে নিজে তাঁর বিচারের কোন রায় দিতে পারলেন না। তিনি কাজীদের বোললেন শাস্তির ব্যবস্থা কোরতে।

অভিযোগকারী কাজী বোললেন ঃ—এর শাস্তি বাইশ বাজারে একে বেঁধে বেত্রাঘাত কোরতে কোরতে প্রাণদণ্ড দিতে হবে। একে একে বাইশ বাজারে বেত্রাঘাত কোরেও যদি তার জীবন না যায় তাহলে বুঝতে হবে, ও যা-তা লোক নয়।

মুলুকপতি সেই আদেশেই বলবৎ রাখলেন।

কাজীর আনন্দে মন উৎফুল্ল।

মুসলমান হোয়ে তিলক কাটে, মালা পরে।

এবার বেতের ঘায়ে ওর তিলক মালা ঘুচাতে হ'বে।

পাইকরা একে একে বাজারে নিয়ে যায় আর গাছের সঙ্গে বেঁধে বেত্রাঘাত করে। হরিদাস হাত পা বাঁধা অবস্থায় শুধু কৃষ্ণ কৃষ্ণ বোলে ওঠেন। এক এক বেত্রাঘাতে এক একবার কৃষ্ণ নাম উচ্চারণ করেন। বেতের ঘায় সমস্ত অঙ্গ তাঁর কেটে যায় রক্ত ঝরতে থাকে। এত আঘাতেও তাঁর কোন ভ্রূক্ষেপ নেই, নেই কোন কথা, নেই কোন কাকুতি মিনতি।

তিনি মুখে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বোলছেন।

কৃষ্ণ নাম যার সারা অঙ্গে তাঁকে বেত্রাঘাতে পরাভূত করে কে ?, এমনি ভাবে বাইশটা বাজারে এসে যখন চরম বেত্রাঘাত কোরতে লাগলো তখন সকল সম্প্রদায়ের মানুষই চোখের জল আর রাখতে পারলেন না।

হরিদাস শুধু কৃষ্ণ কৃষ্ণ বোলছেন।

মনে হোচ্ছে তাঁর দেহের ব্যথা সব যেন জল হোয়ে যাচ্ছে ঐ নামে। যারা বেত্রাঘাত কোরছে তাদের দেহ অবসন্ন। ঘামের বন্যায় তারা স্নান কোরছে।

হরিদাস হাত জোড় করে বোললেন :—

"এসব জীবদের প্রভু করো হে প্রসাদ।
মোরে দ্রোহে নহ এ সবার অপরাধ॥"

এমন মন প্রাণ হরিদাস ছাড়া কার হবে ?

স্বয়ং কৃষ্ণ যে শরীরে বাস করেন তাঁর পক্ষে সবই সম্ভব।

তাই ঠাকুর হরিদাস আজ বৈষ্ণব জগতে সবার শীর্ষস্থানীয়। মহাপ্রভু তাঁকে "পৃথিবীর শিরোমণি" আখ্যা দিয়েছিলেন।

হরিদাসের মৃত্যু হোলনা দেখে পাইকরা বড় চিন্তায় পড়ে গেলো। এত মারেও যে মরেনা সে কেমন ধারা মানুষ!

তাদের মধ্যে একজন বোললেন ঃ—হরিদাস, এত মারেও যখন তুমি মরলে না, তখন তুমি আর মরবে না। কিন্তু ভাই তুমি না মরলে যে আমাদের মরণ হবে।

হরিদাস তাদের বোললেন ঃ—সে কি ভাই, আমি বেঁচে থাকলে তোমরা বাঁচবে না, তা কি কোরে হয়! আমি এখনই মরবো।

এই বোলে তিনি সমাধিস্থ হোলেন।

তাঁর শ্বাস প্রশ্বাস আর চলে না। সবাই ভাবলো মৃত্যুই হেয়েছে তাঁর। হরিদাসের মৃত দেহ বাঁশে বেঁধে নিয়ে যাওয়া হল মুলুকপতির কাছে। তিনি সসম্মানে তাঁকে গোর দিতে বোললেন।

কাজী রাজী নয়।

এই বিধর্ম্মীকে গোর দিলে তো ওর আত্মার সদ্গতি হ'বে। ওকে গংগার জলে ফেলে দিতে হবে। যাতে কোরে জল-জন্তুদের কয়েকদিনের বেশ ভাল ভোজ হয়। যদি জলে ভাসতে ভাসতে কোথাও এসে ঠেকে যায় তাহলে শিয়াল কুকুরে ওকে ছিঁড়ে খাবে। ধর্ম্ম ত্যাগ করলে কি শাস্তি হয় একবার সবাই দেখুক।

কাজীর আদেশে হরিদাস ঠাকুরকে গংগায় ফেলে দেওয়া হলো। পূণ্যতোয়া সুরধনী যেন চমকে উঠলেন।

হরিদাস গংগার জলে ভাসতে ভাসতে চললেন। শেষে যখন

তাঁর সমাধি ভঙ্গ হোল তখন তিনি উঠে বসলেন। জলের ওপর বসে রইলেন। ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভাসতে ভাসতে কুলে চললেন।

কৃষ্ণ যাঁর রক্ষক তাঁর কি মৃত্যু হতে পারে ?

চারিদিকে রাষ্ট্র হোয়ে গেলো এই অলৌকিক ঘটনার কথা। দলে দলে লোক এসে ভীড় করে গঙ্গার ধারে। এলেন মুলুকপতি। এলেন রাজকর্ম্মচারীরা। এলেন সারা ফুলিয়ার লোক।

মুলুকপতি ক্ষমা চাইলেন ঠাকুর হরিদাসের কাছে।

বোললেন ঃ—আপনি যেখানে ইচ্ছে থাকুন। স্বাধীন ভাবে চলাফেরা করুন। কেউ আপনাকে বাধা দেবে না।

হরিদাস শুধু বোললেন ঃ—সবই কৃষ্ণের ইচ্ছা।

গয়াধাম থেকে নিমাই ফিরে এসেছেন নবদ্বীপে।

হরিনামে টলমল কোরছে সারা নবদ্বীপ। নিমাইকে নিয়ে চলছে কত নর্ত্তন কীর্ত্তন।

ঠাকুর হরিদাস পাগল নিমাইয়ের সাথে মিলবার আশায়।

অদ্বৈতাচার্য্য তাঁকে নিয়ে চললেন নিমাইয়ের কাছে। নিমাই তখন নদীয়ার মাথার মণি—সারা নদীয়ায় তাঁর মত পণ্ডিত আর নেই।

নিমাই হরিদাসকে জড়িয়ে ধরলেন।

হৃদয়ে হৃদয়ে মিশে গেলো।

কাঁদছেন ঠাকুর হরিদাস। নিমাইকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছেন।

নিমাই তাঁর গায় হাত বোলাচ্ছে। হরিদাস শান্ত হোল নিমাইয়ের দিকে চাইলেন—ভাব এই, যে এতদিন বাদে মনে পড়ল।

সারা অঙ্গে নিমাইয়ের দাগ দেখে হরিদাস জিজ্ঞাসা কোরলেন —প্রভু তোমার সারা অঙ্গে দাগ কিসের ?

নিমাই রহস্য কোরে বোললেন ঃ—না, না, ও কিছু নয়।

হরিদাস ছাড়বেন না। আবার জানতে চাইলেন ঐ দাগ কিসের।

নিমাই হেসে বোললেন ঃ—এ দাগ বেত্রাঘাতের। ' বাইশ বাজারে তোমার দেহে যত বেত্রাঘাত পড়েছে সবই আমার গায় এসে লেগেছে, তাই ঐ দাগ। তোমার গায় কাঁটার আঁচড় লাগুক এ আমি কি কোরে সহ্য করি!

ঠাকুর হরিদাস বুঝলেন সব। পরে তিনি বোললেন ঃ— আমিও জানতাম প্রভু কেন আমার দেহে আঘাত লাগছে না।

নিমাই নিজের গলার মালা তাঁর গলায় পরিয়ে দিলেন। চন্দন লেপে দিলেন সারা দেহে। তারপর হরিদাসকে খাওয়ালেন পরম সমাদরে।

হরিদাস বোললেন ঃ—প্রভু আমি যে নীচ। এতটা তোমার সাজে না।

নিমাই হরিদাসের মুখের দিকে চেয়ে বোলে উঠলেন ঃ—ভক্ত হরিদাস, তোমাতে আমাতে প্রভেদ কোথায়, তুমি যে আমার চাইতেও বড়। তোমার মত ভক্তি আর কার আছে! আমি তোমার অধীন হরিদাস। তোমার প্রেমভক্তি আমাকে একটু ভিক্ষা দাও হরিদাস। আমি ঘরে ঘরে তা বিলিয়ে বেড়াই।

হরিদাস চেয়ে আছেন নিমাইয়ের দিকে।

তাঁর যেন বাকশক্তি রহিত হোয়ে গেছে।

নিমাই বোললেন ঃ—তোমার নির্য্যাতন দেখে আমি আর থাকতে পারলাম না। তুমি ওদের ক্ষমা কোরলে নইলে ওদের আমি উচিত শিক্ষা দিতাম। তুমি যে কত বড় মহান তা তোমাতেই প্রমাণ। তুমিই পারবে হরিদাস, আমার কাজে তুমিই সহায়

হোতে পারবে। ঘরে ঘরে নাম বিলাও হরিদাস। তোমার কাছ থেকে নদীয়ার মানুষ আগে নাম দীক্ষা নিক।

হরিদাস আনন্দে আত্মহারা হোয়ে পড়লেন।

একবার নিমাইয়ের গায়ের ওপর পড়েন আর একবার পথের ধুলোয় গড়াগড়ি যান।

নিমাই তাঁর হাত ধরে তুলে বলেন ঃ—হরিদাস, তোমাকে আমি সব দিয়েছি, বল আর কি তুমি চাও ?

হরিদাস তাঁর দিকে চেয়ে বোললেন ঃ—প্রভু আমি মহাপাপী। তোমার কৃপা পেলাম আর তো কিছু আমার কাম্য নেই। তোমাকে যে পায় এ দুনিয়ায় তার আর কিছু কি চাইবার থাকে ? তুমি আমাকে এই আশীর্ব্বাদ কর যেন জনমে জনমে তোমার চরণে একটু আশ্রয় পাই।

ভগবান শ্রীচৈতন্য তাঁকে বললেন ঃ—হরিদাস, তুমি কুলের কথা ভাবো কেন! ওসব ঠুনকো জিনিস, আসলে হচ্ছে ভক্তি। সেই ভক্তিতে তুমি মহাভাগবত, তুমি মহাপ্রাণ, তুমি কুলশ্রেষ্ঠ। তোমার তুলনা নেই। তোমার সঙ্গলাভ আর ঈশ্বর লাভ একই। তোমাকে যে পাবে সে ভগবানকে পাবে। তোমার কথা যে ভাববে সে ভগবানের কথা ভাববে। তুমি মানুষকে শিখালে প্রেমধর্ম্ম।

এ সব কথা শুনে অদ্বৈতাচার্য্য প্রভৃতি হরিধ্বনি কোরে ওঠেন।

কেউ এসে হরিদাসের পায়ের ধুলো মাথায় নেন, আবার কেউ বা এসে জড়িয়ে ধরেন তাঁকে।

হরিদাস নাম বিলিয়ে বেড়ান পথে পথে ঘরে ঘরে।

কাজীর বাড়ীর সামনে এসে কীর্ত্তনের দল থামে।

খোল করতালের শব্দে কাজী বড় অস্থির হোয়ে পড়লেন। তিনি পাইককে বোলে দিলেন ঃ—কীর্ত্তনীয়ার দলকে অন্য পথে যেতে।

কিন্তু ঠাকুর হরিদাস কি তাই শোনেন ?

উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন কোরতে শুরু করেন।

কাজী মনে মনে ভয় পেয়ে আর কিছু না বোলে বাড়ীর ভিতর লুকিয়ে থাকেন।

হরিদাস দলবল নিয়ে কীর্ত্তন কোরতে কোরতে চলে যান।

এমন সময় কে যেন তাঁর পায়ের ওপর পড়ে পা জড়িয়ে ধরে।

—কে ?

—ঠাকুর আমি।

হরিদাস ঠাকুর তার দিকে চান কিন্তু চিনতে পারেন না।

এক বৃদ্ধ তার পা ছেড়ে দিয়ে বলে ঃ—ঠাকুর মনে পড়ছে না, তুমি যখন কারাগারে ছিলে তখন তোমাকে আমি পাহারা দিতাম। সেদিন তোমাকে চিনতে পারিনি আজ চিনেছি। তুমি শুধু পীর নয়, পয়গম্বর নয়, তুমি খোদা।

হরিদাস তাকে জড়িয়ে ধরে বোললেন ঃ—না, না ওসব বোলে তুমি আমাকে লজ্জা দিও না। তুমি এই আশীর্ব্বাদ করো আমাকে যেন আমি তাঁর চরণে আশ্রয় পাই।

—ঠাকুর আমার কি গতি হবে !

হরিদাস হাসলেন।

বৃদ্ধ নমস্কার কোরে সরে দাঁড়ালো।

হরিদাস হাত উঁচু কোরে উপরের দিকে দেখালেন।

সবাই জানতে চায় তার গতি কি হবে ! যিনি অগতির গতি তাঁর স্মরণ নিলে যে আর গতির কথা ভাবতে হয় না।

যিনি সকলের গতির জন্য দিনরাত জেগে পাহারা দিচ্ছেন জীবের দ্বারে তাঁর কাছেই আবেদন করো।

তিনি নিশ্চয়ই তোমার গতি কোরবেন।

ওদিকে বেনাপোলের আশ্রমে তুলসী নিত্য কৃষ্ণনাম করেন। দিনেরাতে তিনলক্ষ নাম জপও করে দিন কাটান।

গ্রামের সবাই প্রতি সন্ধ্যায় এসে কীর্ত্তন করে। ঠাকুর হরিদাস যেমন বিকালে ভিক্ষায় বের হোতেন তুলসী কিন্তু কোথাও যেতেন না। গ্রামের থেকে যারা আশ্রমে আসতো তারাই কিছু কিছু ফলমূল দিয়ে যেতো প্রতি সন্ধ্যায় তাই তিনি গ্রহণ কোরতেন।

কোন কোন দিন তার সম্পূর্ণ উপবাসেই কেটে যেতো। তাতে তার কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। জুটলে কিছু গ্রহণ কোরতেন না জুটলে উপবাস কোরতেন। এইভাবে দিন দিন তার দেহ ক্ষীণ হোল কিন্তু নাম জপ তিনি ছাড়েন না। ঘরের ভিতরে এক গোপাল মূর্তি। তিনি তাতেই মন প্রাণ সমর্পণ কোরে পূজার্চ্চনা করেন আর আপন ভাবে বিভোর হোয়ে থাকেন। মাঝে মাঝে তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা গোপালের দিকে চেয়ে থাকেন—দেখে যেন তার আর আশ মেটেনা। যত দেখেন ততই তার তৃষ্ণা বাড়ে।

কৃষ্ণ প্রেমের এমনই গুণ।

ঐ প্রেমে একবার মজলে তার আর নিজের বোলতে কিছুই থাকে না। সর্বস্বত্যাগ না কোরলে তো তাঁকে পাওয়া যায় না।

"এ মাধুর্য্যামৃত পান সদা যেই করে।
তৃষ্ণা শান্তি নহে তৃষ্ণা বাড়ে নিরন্তরে॥
কোটি নেত্র নাই দিল সবে দিল দুই।
তাহাতে নিমেষ কৃষ্ণ কি দেখিব মুঞি॥"

এ দুই চোখে দেখে আর আশ মেটে না।

তুলসীর চোখে জলের ধারা। করজোড়ে প্রার্থনা জানান ঃ—প্রভু, মহাপাপী আমি তাই বুঝি তোমার পরশ পাচ্ছি না। পাপ পুণ্যের মালিক তো তুমি—আমাকে দিয়ে যা করিয়েছো, আমি তাই কোরেছি। তুমি আমাকে কৃপা করো। এ চোখ দুটো বার বার তোমাকে দেখতে চায়। এ চোখ থেকেও যদি তোমার দর্শন না পাই তাহলে এ চোখ রেখে আর কি কোরব! চোখ দুটো দিলে কিন্তু তোমাকে তো দেখতে পাইনে। অন্ধের সংগে আমার প্রভেদ কোথায়? যে চোখ তোমাকে দেখতে পায় না তার সে চোখের কি প্রয়োজন?

"কৃষ্ণাবলোকন বিনা নেত্রে ফল নাহি আন
যেই জন কৃষ্ণ দেখে সেই ভাগ্যবান।"

ওগো পতিতপাবন এ অন্ধচোখ নিয়ে আমি কি কোরব। এ চোখ আমি কুলের কাঁটা দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে অন্ধ কোরে ফেলবো।

তুলসী দুঃখভারাক্রান্ত মন নিয়ে শুধু কাঁদছেন আর উঠানের একপাশে কুল গাছের দিকে এগোচ্ছেন।

কিন্তু কুলগাছে কাঁটা কই? তুলসী বার বার এ ডাল নোয়াচ্ছেন ও ডাল নোয়াচ্ছেন কিন্তু কাঁটা খুঁজে পান না। শেষে তিনি কুলগাছের গোড়ায় অবিরাম চোখ ঘসতে থাকেন আর কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলেন। ঘর্ষণে ঘর্ষণে চোখের পাশ ছড়ে যায়, কেটে যায়, রক্ত ঝরে কিন্তু কই চোখ তো অন্ধ হয় না।

ফিরে আসেন তিনি ব্যথাহত মন নিয়ে গোপালের কাছে।

গড়াগড়ি যান আর কাঁদেন।

ঈশ্বর সর্ব্বত্র। সারা জগত তাঁর সামনে দর্পণের মত ভাসছে।

তিনি সর্ব্বশক্তিমান। তিনি সবকিছু দেখছেন। যে তাঁকে ডাকছে তার ডাকে তিনি সাড়া দিচ্ছেন। যে তাঁকে ডাকছে না, তিনিই তাকে ডাকছেন। তোমার ডাক তাঁর কানে না পৌঁছলে ক্ষতি নেই। তিনি তোমাকে ডাকছেন কান পেতে শোন।

ভক্ত তুলসীর সংকল্পে তিনি অদৃশ্যহস্তে বাধা দিলেন। ভক্তের ব্যথা তো তাঁরই বুকে। তাই গাছের কাঁটা তিনি সরিয়ে নিলেন।

এই তো ঈশ্বর দর্শন।

নাইবা হোল তোমার মনোহারীরূপ অবলোকন।

এইটুকু কৃপা তুমি করো যেন জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত তোমার কথা ভাবতে পারি। তোমাকে যেন ডাকতে পারি। তোমাকে পেলাম না বলে যেন কাঁদতে পারি। তোমার জন্য ভাবতে ভাবতে, কাঁদতে কাঁদতে আমার এ জীবন যেন শেষ হয়।

তুলসী কেঁদে কেঁদে বুক ভাসাচ্ছেন।

ঠাকুরের কথা তাঁর মনে পড়ে। তিনি কতদিন হোল কৃষ্ণ-প্রেমে দীক্ষা দিয়ে চলে গেছেন। আর বুঝি ভাগ্যে হবেনা তাঁর দর্শন। বড় আশা ছিল জীবনের শেষ হিসাবটা তাঁকে দিয়ে যাবো।

তুলসীর দেহ ধীরে ধীরে এত ক্ষীণ হয় যে আর নড়বার শক্তিও তার নেই। তিনি শুধু ঠোঁট দুটো নাড়েন। কাছে গিয়ে কান পাতলে শোনা যায় তিনি কৃষ্ণ কৃষ্ণ কোরছেন।

ঠাকুর হরিদাস নবদ্বীপে বসে জপ কোরতে কোরতে হঠাৎ কেন জানি চঞ্চল হোয়ে ওঠেন। তিনি হাসেন আর বলেন ঃ—তুলসী, তুমি নামেও তুলসী কাজেও তুলসী। তোমার নামে অর্দ্ধপাপক্ষয়।

ঠাকুর হরিদাস হাসছেন ঃ—তুমি যাঁর আশ্রয়ে আছো তিনি কি তোমাকে কাঁটার আঁচড় লাগতে দেন—তিনিই তো দেখলাম কুলগাছের সব কাঁটাগুলো ভেঙে ফেললেন।

তিনি সমাধিস্থ হোয়ে পড়লেন। তার বাহ্যজ্ঞান সব লুপ্ত হোয়ে গেলো।

তুলসী তখন উঠে বসেছে কোনরকমে। সময় সন্ধ্যা। চারিদিকে তেমনি অন্ধকার। তুলসী ঠোঁট নেড়ে নাম জপ কোরছে। হঠাৎ তিনি চমকে উঠলেন ঃ—ঠাকুর তুমি এসেছো। আমি যে তোমার জন্যই এতক্ষণ যেতে পারছিলাম না। বড় সুখ শান্তি আমার। অন্তিম সময়ে আমার গোপালের পাশে তুমিও দেখা দিলে। ওগো ঠাকুর একটু আশীর্ব্বাদ করো এই দুঃখিনীকে—কৃষ্ণদরশনের লোভ আমার রয়ে গেলো। আবার যদি আসি যেন সে নাম আমি ভুলিনা।

চারিদিক নিস্তব্ধ নির্জ্জন!

এই নির্জ্জনতার মাঝে তুলসীর জীবনদীপ নিভে গেলো।

এক বৈশাখে শ্রীচৈতন্য দক্ষিণদেশে যাত্রা কোরলেন আবার রথযাত্রার আগেই তিনি নীলাচলে ফিরে এলেন। সেটা ১৪৩৪ সাল। নীলাচলে ফিরে এসে সংবাদ পাঠালেন নবদ্বীপে। এই সংবাদ পেয়ে নবদ্বীপের ভক্তরা নীলাচলে যাত্রা কোরলেন। ঠাকুর হরিদাসও এলেন তাঁদের সঙ্গে।

কুলীন গ্রামের শিবানন্দ পথকর দেওয়ার কাজে নিযুক্ত ছিলেন। সবাই এসে সেখানে মিললেন। শিবানন্দর সঙ্গে একটা কুকুর থাকতো সবসময়। তিনি তাকে খেতে দিতেন আর খুব যত্ন কোরতেন। একদিন শিবানন্দ নদী পার হোতে যাবেন কিন্তু কুকুরকে নৌকায় কিছুতেই উঠতে দিল না উড়ে মাঝি।

শিবানন্দ কুকুর ছাড়া পার হবেন না। শেষে দশপণ কড়ি দিয়ে পার হোলেন। তিনি কুকুরকে খেতে দেওয়ার জন্য একটা লোক রাখলেন। সে সারাদিন কুকুরের দেখাশোনা কোরত।

একদিন রাত্রিতে খেতে বসে শিবানন্দ কুকুরের খাওয়া হোয়েছে কিনা জিজ্ঞেস করায় জানতে পারলেন যে কুকুর ভাত খায়নি। একথা শুনে শিবানন্দ ভয়ানক দুঃখ পেলেন। কুকুর আর তিনি খুঁজে পেলেন না। সে রাত্রি শিবানন্দের উপবাসেই কেটে গেলো। পরদিন সকালেও কুকুরের সন্ধান না পেয়ে সবাই মিলে নীলাচলে মহাপ্রভু যেখানে অবস্থান কোরছেন সেখানে এলেন।

সবাইকে নিয়ে মহাপ্রভু জগন্নাথ দরশন কোরলেন। একত্রে বসিয়ে সবাইকে খাওয়ালেন। খাওয়া সাঙ্গ হোলে যে যার বাস-স্থানে চলে গেলেন।

পরদিন আবার সবাই মহাপ্রভুর কাছে গিয়ে দেখেন কিছু দূরে কুকুরটা শুয়ে পরমানন্দে লেজ নাড়ছে। মহাপ্রভু ফলমূল নিজে খেয়ে প্রসাদী কোরে কুকুরকে দিচ্ছেন আর সে আনন্দে তাই খাচ্ছে। মহাপ্রভু বোলছেন—বল কৃষ্ণ, বল রাম, বল হরি। কুকুর খাচ্ছে আর কৃষ্ণ কৃষ্ণ বোলছে। সবাই এ দৃশ্য দেখে আশ্চর্য্য হোয়ে যায়।

শিবানন্দ সেখানে বার বার প্রণাম কোরলেন কিন্তু তারপর আর কুকুরকে কেউ দেখতে পেলো না—সিদ্ধদেহে কুকুর তখন বৈকুণ্ঠের পথে পাড়ি জমিয়েছে।

দেবতার লীলা দেবতাই জানেন। কুকুরকে কৃষ্ণ বলালেন তিনি। কুকুর স্বর্গে গেলো। তিনি সব পারেন—তাঁর কৃপা হোলে কুকুরও কৃষ্ণনাম বলে। তাঁর কৃপা হোলে কুলগাছের কাঁটাও সব ভেঙে যায়। তিনি যে কৃপাময়।

এদিকে মহাপ্রভু রূপগোঁসাইকে বৃন্দাবন যাবার আদেশ দিলেন। কৃষ্ণলীলা নাটক লেখা হবে। বৃন্দাবনেই সুরু হল

নাটক। রূপ গোঁসাই নাটকের কথা ভাবতে ভাবতে গৌড়ে এলেন। ছোট ভাই অনুপম এখানে এসে দেহত্যাগ কোরলেন।

মহাপ্রভুর দর্শনলাভের জন্য গোঁসাইয়ের প্রবল উৎকণ্ঠা। হাঁটতে হাঁটতে একরাত্রি উড়িষ্যার সত্যভামাপুরে এসে বাস কোরলেন। সেই রাত্রে স্বপ্ন দেখলেন এক দিব্যকান্তি নারী বোলছেন—

"আমার নাটক পৃথক করহ রচন।
আমার কৃপাতে নাটক হবে বিচক্ষণ ॥

সত্যভামার নির্দ্দেশে নাটক দুই ভাগে লেখাই শ্রেয় হবে।

ভাবতে ভাবতে রূপ গোঁসাই নীলাচলে ঠাকুর হরিদাসের আস্তানায় উঠলেন।

হরিদাস বোললেন ঃ—তুমি আসবে তা আমি প্রভুর মুখে আগেই শুনেছি।

রূপ মহাপ্রভুকে দেখবার জন্য চঞ্চল হোলেন।

হরিদাস আশ্বস্ত কোরলেন ঃ—তিনি এখনই আসবেন।

মহাপ্রভু এসে সবাইকে আলিঙ্গন কোরলেন।

মহাপ্রভু বোললেন ঃ—সনাতন কোথায় ?

রূপ জবাব দেন ঃ—তার সংবাদ প্রভু আমি জানি না। আমি গংগা ধরে এলাম। সে আসছে স্থলপথে।

মহাপ্রভু বলেন অদ্বৈতাচার্য্য আর নিত্যানন্দকে ঃ—তোমরা রূপকে একটু কৃপা করো। তোমরা দুইজন ওর দেহমনে কৃষ্ণ-শক্তির সঞ্চার করো যাতে ওর রচিত কৃষ্ণলীলা কৃষ্ণরস ভক্তিতে রসসিক্ত হোয়ে ওঠে।

প্রভু নিত্য এসে রূপকে প্রসাদ দেন। রূপের আনন্দ আর ধরে না। যিনি সদানন্দময় তিনি তাকে নিত্য কৃপা কোরছেন এ

ভাগ্যে কার না আনন্দ হয়। মহাপ্রভু প্রসাদ দেন আর সবাই মিলে আনন্দে নৃত্য করেন আর খান।

মহাপ্রভু রূপকে বলেন ঃ—তোমার কৃষ্ণলীলা রচনায় আমি কিছু উপদেশ দেবো।

রূপ মাথা নীচু কোরে বলেন ঃ—ধন্য হোলাম। প্রভু আদেশ করুন আমাকে কি কোরতে হবে? যাঁর লীলা তাঁর শ্রীমুখে শুনে ধন্য হই।

প্রভু বলেন—

“কৃষ্ণকে বাহির নাহি করিহ ব্রজ হৈতে
ব্রজ ছাড়ি কৃষ্ণ কভু যান না কাঁহাতে ॥”

রূপ ধন্য হোলেন মহাপ্রভুর কথা শুনে।

রথযাত্রায় জগন্নাথ দর্শন কোরলেন শ্রীরূপ।

রথের আগে মহাপ্রভু নৃত্য কোরছেন। শ্রীরূপ ভাবের সন্ধান জানেন তাই মহাপ্রভুর মুখের শ্লোকের ব্যাখ্যা তখনই কোরে। ফেললেন।

শ্রীরূপ গোস্বামী তালপাতায় শ্লোক লিখে চালে গুজে রেখে সমুদ্রস্নানে গেলেন।

মহাপ্রভু এলেন এমন সময় তিনি সেই তালপত্র বের কোরে পড়লেন সেই শ্লোক। সেই শ্লোক পাঠ কোরে মহাপ্রভু প্রেমাবিষ্ট হোলেন। স্নান শেষে শ্রীরূপ এলে মহাপ্রভু তাকে জড়িয়ে ধরে বোললেন ঃ—তুমি কি কোরে জানলে আমার ভিতরের কথা?

শ্রীরূপ বলেন ঃ—তোমার কৃপা না হোলে তোমার কথা জানবো কি কোরে? তুমি না জানালে জানে কার সাধ্য!

মহাপ্রভু দাঁড়িয়ে আছেন শ্রীরূপরে দিকে চেয়ে।

শ্রীরূপ বোললেন ঃ—হে পদ্মলোচন ! তোমার চরণই সার কোরে চলছি। হাসছি কাঁদছি। ঐ চরণ ছাড়া যে আমার আর কোন গতি নেই। সংসারের কূপে পড়ে যারা হাবুডুবু খাচ্ছে তাদের দিকে তোমার চরণ বাড়িয়ে দাও। তোমার চরণ ধরে তারা উঠে আসুক।

হরিদাস জগন্নাথ দর্শনে না গিয়ে রাজপথের একপাশে পড়ে রইলেন। কেমন কোরে তিনি প্রবেশ কোরবেন শ্রীক্ষেত্রে। নিজেকে অতি নীচজ্ঞান কোরেই তিনি পড়ে রইলেন রাস্তার এক পাশে।

অন্যান্য ভক্তরা মহাপ্রভুর কাছে যেতেই তিনি বোললেন ঃ—হরিদাস কোথায় ?

এই কথা শুনে সবাই এসে হারিদাসকে বোললেন ঃ—চলো, প্রভু তোমাকে ডাকছেন।

হরিদাস কাতর ভাবে বোললেন ঃ—আমি যে অস্পৃশ্য, মন্দিরে যাবো কি কোরে—নির্জ্জন একটা ঘর পেলে সেখানে থেকেই প্রভুর নাম গান কোরতাম।

মহাপ্রভুর কানে এ সংবাদ যেতেই তিনি কাশী মিশ্রের বাগানের ভিতর একটা ঘরে তাঁকে থাকতে আদেশ কোরলেন আর বোললেন ঃ—হরিদাস, আমি রোজ তোমাকে এইখানে দর্শন দেবো—এখান থেকেই তোমার প্রণাম আমি গ্রহণ কোরব।

মহাপ্রভুর ভৃত্য এখানেই নিত্য প্রসাদ দিয়ে যান তিনি তাই খান আর আনন্দে নাম গান করেন।

একদিন মহাপ্রভু এলেন হরিদাসের কাছে। তাঁর মুখ বড় বিষণ্ণ। হরিদাসের দিকে বার বার চাইছেন আর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলছেন।

হরিদাস বুঝি জানেন শ্রীহরির অন্তর বেদনা।

ভক্ত না হোলে ভগবানকে জানবে কে?

তিনি বোললেন ঃ—প্রভু তোমার বিষণ্ন বদন কেন?

মহাপ্রভু গভীর দুঃখে বোললেন ঃ—হরিদাস! কলিকালে যবনের ক্রিয়াকলাপ আমাকে বড় ভাবিয়ে তুলেছে—এরা এমনই দুরাচার গোব্রাহ্মণকে হিংসা করে। এদের কথা ভেবে মন আমার বড় ব্যাকুল হোয়েছে। এরা নিস্তার পাবে কিভাবে!

হরিদাস বোললেন ঃ—প্রভু তুমি চিন্তা কোর না। যবনের সংসার এমনই দুঃখময় কিছুমাত্র ভাবনা কোর না। এদের মুক্তি খুব সহজেই হ'বে। এরা হারাম হারাম বলে কিন্তু সে কথা হা রাম হা রাম বোলেই তো এরা দিবারাত্র উচ্চারণ কোরছে। এই যে নাম অভ্যাস এদের হোচ্ছে এতেই এদের মুক্তি হ'বে। নিষ্ঠার সংগে একাগ্রতার সংগে রাম নাম যে উচ্চারণ কোরবে সে তো পারের কড়ি পেয়ে গেলো।

মহাপ্রভু তন্ময় হোয়ে যান হরিদাসের কথায়।

হরিদাস কাঁদছেন।

মহাপ্রভু ব্যস্ত হোয়ে তাঁকে আলিঙ্গন কোরে বোললেন ঃ—তোমার চোখে জল কেন হরিদাস?

—সবই তুমি জানো! তুমি হাসাচ্ছো তুমি কাঁদাচ্ছো।

মহাপ্রভু তাঁর মাথায় হাত রাখেন।

ঠাকুর হরিদাস সমাধিস্থ হোয়ে পড়েন।

ঈশ্বরের নাম যে যেভাবে উচ্চারণ করে, যে স্মরণ করে বা শোনে ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক, শুদ্ধ ভাবেই হোক আর অশুদ্ধ ভাবেই হোক একবার উচ্চারণ কোরলে তার মহামুক্তি।

তুমি সংসারী, তুমি সংসারের খেলায় পাগল, পুত্রকন্যা নিয়ে

তোমার সারাদিন কাটছে। ঈশ্বরের নাম কোরবার সময় তোমার কোথায় ? তাতে কি যায় আসে ! সংসারে থেকে ঈশ্বরলাভ হয় তার প্রমাণ স্বয়ং মহাপ্রভু। তিনিও তো সংসার পেতেছিলেন। তিনিও তো মায়ায় আবদ্ধ হোয়েছিলেন। তিনি নিজে আচরণ করে দেখিয়ে গেলেন কি কোরে সংসারে থেকে প্রেম সাধনা কোরতে হয়।

আসল বস্তু হোচ্ছে লক্ষ্য।

এই লক্ষ্য যদি থাকে তাহলেই হবে।

মোহান্ধ জীবের পরিণতি কোথায় তা সবাই অনুভব করে কিন্তু নিজে বুঝেও অবুঝ হোয়ে শত দুঃখ কষ্টকে আলিঙ্গন করে।

কলির জীব লোভের পাত্র মুখে কোরে মায়ার রজ্জু বেঁধে তাতে দিনের পর দিন সংসারের এই যন্ত্রণাময় কুপে নেমে চলেছে। কি কোরে ওপরে আবার উঠবে ?

ওপরে উঠতে হোলে চাই চৈতন্য চাই ভক্তি চাই অনুরাগ।

সে অনুরাগ কৃষ্ণানুরাগ।

এই কৃষ্ণানুরাগই তো ভবযন্ত্রণার প্রলেপ, ভব ব্যাধির বিশল্যকরণী।

এমন প্রেমধর্ম্ম কি আর কোথাও আছে !

ভক্তিতে যে মুক্তি পায়। কৃষ্ণাশক্তিতে যার সর্বপাপক্ষয়।

কৃষ্ণপ্রেমের পাঠ হোচ্ছে নববিধাভক্তি।

শ্রবণ, কীর্ত্তন, বিষ্ণুস্মরণ, পদ সেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য আর আত্মনিবেদন।

এই নববিধা ভক্তি যার আছে তার হৃদয়েই কৃষ্ণ ঘর বাঁধেন।

ঠাকুর হরিদাস এই নববিধাভক্তির সাধন ভজন করেন। তাঁই তিনি পেয়েছেন কৃষ্ণকৃপা আর সাথে সাথে পরম দয়াল কৃষ্ণকে।

"দেহত্যাগে কৃষ্ণ না পাই পাইয়ে ভজনে।
কৃষ্ণ প্রাপ্তের উপায় কোন নাহি ভক্তি বিনে॥
ভক্তি বিনা কৃষ্ণে প্রভু নহে প্রেমোদয়।
প্রেম বিনা কৃষ্ণ প্রাপ্তি অন্য হৈতে নয়॥"

হরিদাসের মত সনাতন নিজের দৈন্য প্রকাশ কোরতেন। কৃষ্ণচরণ না পাওয়ায় দুঃখে তিনি দেহত্যাগের সঙ্কল্প করেন। কারণ নীচকুলে তাঁর জন্ম এই কথা তিনি সবসময় ভাবতেন।

মহাপ্রভু তাকে আশ্বস্ত করেন। বলেনঃ—সনাতন, নীচ-জাতি কৃষ্ণ ভজনে অযোগ্য কে তোমাকে বোললে। ব্রাহ্মণও সৎকুলে জন্ম গ্রহণ কোরে ভজনের যোগ্য হয় না। কৃষ্ণভজনে কোন জাতিকুল বিচার নেই।

সনাতন বলেনঃ—আমাকে বাঁচিয়ে রেখে তোমার তো কোন লাভ হবে না প্রভু।

মহাপ্রভু জবাব দেন—তোমার দেহ আমার নিজধন, পরের দেহ তুমি বিনাশ কোরতে পারোনা। সনাতন তোমাকে দিয়ে আমার অনেক কাজ হবে।

সনাতনের দুইচক্ষু অশ্রুসিক্ত হোয়ে ওঠে। দুচোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ে।

তিনি বলেনঃ—তোমাকে বুঝি এমন সাধ্য আমার নেই। কাঠের পুতুলের মত যে ভাবে আমাকে নাচাচ্ছো সেই ভাবেই নাচছি। কেন নাচাচ্ছো তা আমি জানি না।

মহাপ্রভু হরিদাসকে বলেনঃ—পরের জিনিষ দান করাও অন্যায়। এমন অন্যায় যেন কেউ না করে।

হরিদাস হাসেন আর বলেনঃ—তোমার ভাব বুঝবো সে ভাব আমার কই। তুমি না জানালে কি কোরে জানবো!

পরে সনাতনের দিকে চেয়ে বলেন ঃ—সনাতন, তোমার মত ভাগ্যবান আর কে আছে। প্রভু তোমার দেহকে নিজধন বোলে মনে করেন। তাই ভাবি আমার এ দেহ প্রভুর কোন কাজেই লাগলোনা। এ জন্ম আমার বৃথাই গেলো।

সনাতন হরিদাসকে করযোড়ে বলেন ঃ—তোমার সাথে কারও তুলনা হয় না। তোমার মত ভক্তি আছে কার, যে দিনে রাতে তিনলক্ষ নাম করে সে যে কি তা আমি ভাবতেও পারি না। তুমি যে ভাবনার অতীত। তোমার প্রেমভক্তির এক কণা যদি আমি পেতাম তাহলে আমার মনুষ্য জন্ম সার্থক হোত।

একটু থেমে বলে সনাতন—

আপনি আচরি, কেহ না করে প্রচার।
প্রচার করহে কেহ না করে আচার॥
আচার প্রচার নামের কর দুই কার্য্য।
তুমি সর্ব গুরু সর্বজগতের আর্য্য॥

হরিদাস আপন ভাবে নাম জপ করেন।

এই কাজের জন্যই বুঝি তাঁর জন্ম। এ ছাড়া তিনি অন্য কিছু জানেন না।

হে মহাভাগবত হরিদাস, হে, কৃষ্ণ কৃপা ধন্য হরিদাস—কলির জীবের কানে কানে ছড়াও তোমার মহা নাম, শিখিয়ে দাও কেমন কোরে নাম কোরতে কোরতে নামীর সন্ধান পাওয়া যায়। বুঝিয়ে দাও তোমার এ ভক্তির উৎস কোথায়? জানিয়ে দাও কেমন কোরে সেই অজানাকে জানা যাবে। সংসারের কঠিন রথচক্রে অনবরত যারা পিষ্ট হোচ্ছে তাদের তুমি ইষ্টজ্ঞান দাও। জীবন তরী যে পারের ঘাটে এসে দাঁড়ালো কেমন কোরে পার হবো এই ভবসমুদ্র কোন সম্বলই তো নেই।

সাধন ভজনহীন জীবন তো মৃত—এই মৃতদের কি পারের কাণ্ডারী শেষের দিনে একটু চরণ স্পর্শ দেবেন ? কি গতি হবে এদের ?

হরিদাসও এগিয়ে চলেন বার্দ্ধক্যের পথে।

আশী বছরের পুরানো দেহ আর যেন তিনি বইতে পারেন না। বয়সের ভারে নুয়ে পড়লেও এখনও তিনি তিনলক্ষ নাম জপ করেন।

অভ্যাসের দাস না হলে কৃষ্ণদাস হওয়া যায় না।

প্রভু-ভৃত্য গোবিন্দ নিত্য মহাপ্রসাদ নিয়ে এসে হরিদাসকে দিয়ে যায়।

সেদিনও এলেন গোবিন্দ মহাপ্রসাদ নিয়ে।

হরিদাস শুয়ে শুয়ে অতি ক্ষীণ কণ্ঠে নাম কীর্ত্তন কোরছেন। গলার স্বরেও কেমন যেন একটা অস্পষ্টতা।

গোবিন্দ প্রসাদ হাতে নিয়ে বোলে ওঠে ঃ—কই উঠে এসে মহাপ্রসাদ ভোজন করো।

হরিদাস ধীরে ধীরে বলেন ঃ—গোবিন্দ, আজ আমাকে উপবাসে কাটাতে হবে।

—কেন ঠাকুর ?

—আজ যে আমার নাম এখনও পূর্ণ হয়নি। নাম শেষ না কোরে কিভাবে খাই।

হরিদাস মহা সমস্যায় পড়েন।

এদিকে মহাপ্রসাদ ফেরতও দিতে পারেন না। এক কণিকা প্রসাদ তিনি মুখে তুলে দিলেন।

পরদিন মহাপ্রভু এলেন হরিদাসের কাছে।

মহাপ্রভুকে দেখে হরিদাস তাড়াতাড়ি উঠতে গিয়েও পারলেন না।

মহাপ্রভু ব্যস্তভাবে বোললেন:—শুয়ে থাকো হরিদাস। সুস্থ হও।

হরিদাস কোন কথা বলেন না শুধু তাঁর দিকে চেয়ে থাকেন।

—কি তোমার ব্যাধি? কি তোমার কষ্ট যাতে তুমি নাম শেষ কোরতে পারছো না।

হরিদাস বলেন:—তুমি এসেছো, আর তো আমার কোন কষ্ট নেই। তুমি যে ভববৈদ্য! তোমার আসার সাথে সাথে আমার সব ব্যাধি চলে গেছে।

মহাপ্রভু চিন্তিত হোয়ে বলেন:—এখন তোমার বয়স হোয়েছে হরিদাস নামের সংখ্যা অল্প করো। তোমার এ সিদ্ধদেহে আর সাধনের আগ্রহ নাই বা থাকলো। নাম প্রচারের জন্য এ দেহ তোমার। সে কাজ তুমি ভালভাবেই সমাধা কোরেছো।

হরিদাস ক্ষীণকণ্ঠে বলেন:—নীচকুলে জন্মে আমি বিপ্রের শ্রদ্ধাপাত্র হোলাম। অস্পৃশ্য হোয়েও আমি তোমার পরশ পেলাম। তুমি আমাকে নরক থেকে উদ্ধার কোরে বৈকুণ্ঠের পথ দেখালে। আমি অনেক পেলাম, যা এ হীন জীবনে আশা করিনি। তুমি যে স্বতন্ত্র ঈশ্বর। যেমন ইচ্ছা হোল তোমার তাই তুমি কোরলে। এখন একটি মাত্র ইচ্ছা আমার আছে—এইটা তুমি পূরণ কোরলে মনুষ্যজন্ম সার্থক হয়।

মহাপ্রভু বলেন স্মিতহাস্যে:—বল হরিদাস, তোমার কি ইচ্ছা?

—আমার মন বোলছে তুমি যথাসত্বরই তোমার লীলা সম্বরণ কোরবে, সেই লীলা আমি আর দেখতে চাইনা। তোমার লীলা সম্বরণের আগেই যেন আমি এ দেহ ত্যাগ কোরতে পারি। তোমার ঐ রাঙাচরণ দুখানি আমার বুকের ওপর রেখে এই দুই চোখে তোমার অপরূপ রূপ দর্শন কোরে তোমার কৃষ্ণচৈতন্য নাম

উচ্চারণ কোরতে কোরতে আমার এ প্রাণ যেন যায়। তুমি কৃপা কোরে আমার এই বাসনা পূর্ণ করো।

মহাপ্রভু বোললেন ঃ—কৃষ্ণ কৃপায় তোমার সে বাসনা অবশ্যই পূর্ণ হবে! কিন্তু তুমি আমাকে ছেড়ে যাবে এ কেমন কথা!

হরিদাস শুয়ে শুয়ে তাঁর পাদস্পর্শ কোরে বলেন ঃ—আর মায়ায় তুমি জড়িও না আমাকে প্রভু। আমার মত ক্ষুদ্র একটা পিঁপড়ে মরলে পৃথিবীর কোন ক্ষতি হবে না। আজ এখন চলে যাচ্ছো কিন্তু কাল অবশ্যই আসবে। মহাপ্রভু তাঁকে আলিঙ্গন কোরে চলে গেলেন।

পরদিন প্রভাতে মহাপ্রভু ভক্তবৃন্দ সাথে কোরে হরিদাসের কাছে এলেন। হরিদাস সবাইয়ের চরণ বন্দনা কোরলেন।

মহাপ্রভু বললেন ঃ—আমি এলাম হরিদাস।

হরিদাস বললেন ঃ—আমিও পেলাম প্রভু।

ঠাকুর হরিদাসকে ঘিরে সবাই কীর্তন কোরতে লাগলেন।

রামানন্দ সার্ব্বভৌম হরিদাসের গুণকীর্ত্তন কোরতে থাকেন পঞ্চমুখ হোয়ে।

মহাপ্রভু ভক্তপ্রশংসায় আনন্দে আত্মহারা।

ভক্তের গুণে ভগবান গুণবান।

হরিদাস সকল ভক্তের পদধূলি মাথায় দিলেন। সারা অঙ্গে সেই ধূলো মাখলেন। তারপর হরিদাস মহাপ্রভুকে সামনে বসিয়ে তাঁর চরণ দুখানা নিজের বুকের ওপর রেখে বার বার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বোলতে বোলতে একসময় তাঁর প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেল। ইচ্ছামৃত্যু বরণ কোরেছিলেন ভীষ্ম শ্রীকৃষ্ণকে সামনে রেখে আর আজ ঠাকুর হরিদাস সেই মৃত্যু বরণ কোরলেন মহাপ্রভুকে সামনে রেখে।

হরিধ্বনি দিয়ে উঠলেন সমস্ত ভক্তবৃন্দ। মহাপ্রভু হরিদাসের দেহ কোলে তুলে নিয়ে প্রেমাবিষ্ট হোয়ে হরিদাস অংগনে নৃত্য কোরতে লাগলেন।

তারপর সবাই মিলে হরিদাসের দেহ সমুদ্রতীরে নিয়ে গেলেন। সবার সামনে মহাপ্রভু নৃত্য কোরতে কোরতে চললেন।

হরিদাসের দেহ সমুদ্রে স্নান করানো হোল।

মহাপ্রভু বোললেন ঃ—আজ এই সমুদ্র মহাতীর্থ হোল।

সকলে মিলে হরিদাসের পদধূলি গ্রহণ কোরলেন। চন্দনে তাঁর সারা দেহ লেপে দিলেন সবাই।

সমুদ্র তীরে বালুকার ভিতর গর্ত্ত কোরে জগন্নাথদেবের প্রসাদী বস্ত্র তাব ভিতর দিয়ে সেই গর্ত্তের ভিতর শুইয়ে দিলেন।

চারিদিকে ভক্তরা কীর্ত্তন কোরতে থাকেন।

মহাপ্রভু নিজে 'হরিবোল' বোলে সেই গর্ত্তে বালি দিলেন।

হরিদাসকে ঘিরে সবাই হরিনাম করেন আর করতালি দেন।

তারপর মহাপ্রভু নিজে আঁচল পেতে নগরভিক্ষা কোবলেন। যত বৈষ্ণব সবাইকে ব'সিয়ে প্রসাদ পরিবেশন কোরলেন নিজ হাতে এবং নিজেও সকলের সাথে বসে খেলেন মহানন্দে।

ভোজন সমাপনান্তে মহাপ্রভু সবাইকে বোলতে লাগলেন ঃ— যাঁরা হরিদাসের এই বিজয়োৎসব দর্শন কোরলেন, যাঁরা নৃত্য ও কীর্ত্তন কোরলেন, যাঁরা তাঁর পবিত্র দেহে বালুকা দিলেন, যাঁরা এই মহোৎসবে ভোজন কোরলেন, তাঁরা সবাই শ্রীকৃষ্ণের চরণ লাভ কোরবেন। এমন সজ্জন সঙ্গ কৃষ্ণ কৃপা কোরে আমাকে দিয়েছিলেন কিন্তু তিনি সে সৎসঙ্গ কেড়ে নিলেন। হরিদাস নিজেই পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন। আমি তাঁকে ধরে রাখতে পারলাম না।

হর্ষ ও বিষাদের ভিতরে এই মহোৎসবের সমাপ্তি ঘটলো।

"এই তো কহিল হরিদাসের বিজয়।
যাহার শ্রবণে কৃষ্ণে প্রেমভক্তি হয়॥
চৈতন্যের ভক্তবাৎসল্য ইহাতেই জানি।
ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ কৈল ন্যাসি শিরোমণি॥
মহাভাগবত হরিদাস পরম বিদ্বান।
এ সৌভাগ্যে লাগি আগে করিল প্রয়াণ॥
